দ্বিতীয় অধ্যায়
মুদ্রণ যুগের ছড়া ঃ কয়েকটি প্রবণতা

লৌকিক ছড়ার উৎস কোথায় এবং তাদের রচনাকার কারা, রচনা তারিখ কত, এসব প্রশ্নের কোন জবাব মেলে না। কিন্তু গ্রাম-গঞ্জের শিশুদের মুখে মুখে যেগুলি অনবরত ধ্বনিত হয় অথবা শিশুদের ভোলাতে যেগুলিকে জননীরা ছড়ার ছন্দের দোলায় দুলিয়ে দেন, সেই সব লৌকিক ছড়া বাংলা লোকসাহিত্যের বহুমূল্যবান সম্পদ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় — সেগুলি আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বাংলার সব অঞ্চলেই ছড়াগুলি আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়ে প্রচলিত। এই সমস্ত ছড়াতে বয়ে চলে স্বতঃস্ফূর্ত এক রসধারা, থাকে না ভালো মন্দের কোন বিচার। এর এলোমেলো শব্দ দ্বারা গঠিত বাক্যই মনের আনন্দকে বাড়িয়ে তোলে, তাই মস্তিষ্কের তুলনায় হৃদয়ের স্থান সেগুলিতে অনেক বেশি।

ছোট্ট শিশুদের হৃদয়কে জয় করার প্রয়াস কখনই থেমে থাকে না । তাই লৌকিক ছড়ার ভাব-ভাষা, রূপ-ছন্দের সাধারণ প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আধুনিক কালের শিক্ষিত কবিরাও তাঁদের কলমকে প্রসারিত করেছেন সেই সব প্রজন্মের শিশুদের মন ভোলাতে। আধুনিক ছড়া রচনা করে তাঁরা তাঁদের সৃষ্টিতে এনেছেন এক নতুন জোয়ার। এই সমস্ত ছড়াকারদের রচিত ছড়াগুলি প্রাচীন ছড়ার পাশাপাশি '' মুদ্রণ যুগের ছড়া'' নাম দিয়ে আলোচনা করা যায়। এগুলি গ্রামগঞ্জের অ-শিক্ষিত, স্বল্প-শিক্ষিত বা সাধারণ মানুষের মুখে মুখে তেমন ফেরে না, মুদ্রিত সাহিত্যেই এদের স্থান বেশি। প্রাচীন ছড়াগুলি মৌখিক অথচ প্রাচীন লৌকিক ছড়ার ছাঁদেই আধুনিক সাহিত্যকরা লিখেছেন।

আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এজাতীয় ছড়াগুলিকে সাহিত্যিক ছড়া বলে অভিহিত করেছেন। এই ছড়াগুলি সচেতন প্রতিভার বুদ্ধিপ্রাধান সৃষ্টি হলেও এদের গায়ে মাতৃদুগ্ধের অ-বোধ গন্ধটুকু লেগে আছে বলে তিনি মনে করেন। তাই এই ছড়াগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ যাই হোক না কেন, লৌকিক ছড়ার তুলনায় যতই আধুনিক হোক না কেন, মূলত এগুলি ছড়া।

স্বভাবতই এখানে প্রশ্ন এসে যায় আধুনিক ছড়াকাররা অশিক্ষিত, অপটু লৌকিক ছড়াগুলির প্রভাবে প্রভাবিত হলেন কিভাবে? এ প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের ''খুকুমনির ছড়া'' প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ —

''এই শিশু সুলভ প্রকৃতি যে বয়োবৃদ্ধি সহকারে একেবারেই লোপ পায়, এমন মনে করা ভ্রম। বয়োবৃদ্ধির মধ্যেও এই শৈশবোচিত অস্তিত্ব নিতান্ত বিরল নহে।''১ মুদ্রণ যুগের ছড়াগুলির জন্ম রহস্য জানাতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, —

‘‘বাঙালি শিশু মাতৃদুগ্ধের সহিত মায়ের মুখের নানা প্রকার ছড়া-কবিতার যে রস পান করিয়া থাকে তাহার সংস্কার সে কোনদিনই ভুলিতে পারে না। দোলনার দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে ছড়ার ছন্দের যে দোল তাহার রক্তের মধ্যে লাগিয়া যায়, তাহার সংস্কারকে ভুলিতে পারে না বলিয়াই বোধ হয় সাহিত্যিক ছড়ার জন্ম সম্ভব হয়।’’ ২

আবার উনিশ শতকে এসে আধুনিক শিক্ষিত মন রেনেসাঁসের যুক্তি, দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ছড়ার মধ্যে চিরন্তন আধুনিকতার দিকটি তুলে ধরেছেন। আধুনিক মুদ্রিত ছড়ার বৈশিষ্ট্য কয়েকটি — (১) শিক্ষিত নাগরিক ভাবনার বৈচিত্র্য। (২) ভাষার পরিবর্তন। (৩) সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রতিফলন।

আধুনিকতা প্রাথমিকভাবে সেইসব চিন্তাধারা যা রেনেসাঁস সমাজতন্ত্র, উপনিবেশবাদ — সংগ্রাম, বিশ্বযুদ্ধ, জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকবাদ ইত্যাদি প্রত্যয় ও ঘটনার মধ্য দিয়ে বিকাশিত সময়ের প্রতিনিধিত্ব করে। ইতিহাস বলে যে দেশে যখন রেনেসাঁস সূচিত হয়েছে সেই দেশে তখন থেকেই আধুনিক যুগের সুত্রপাত। আমাদের দেশ ভারত তথা বাংলা ও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের রেনেসাঁসের সময়কাল উনবিংশ শতাব্দী হলেও লৌকিক ছড়ার সূত্রপাত তার অনেক আগে অর্থাৎ সপ্তদশ, অষ্টাদশ এমনকি তার আগেও রচিত হতে পারে। আর এই লৌকিক ছড়া বাংশানুক্রমিক ভাবে বয়ে এসে জ্ঞান বা জ্ঞানের পরিবর্তমানতায় উনবিংশ শতাব্দীতে এসে আধুনিক শিক্ষিত মনের চিন্তা-ভাবনায় আধুনিকতায় রূপান্তরিত হয়েছে।

কবি স্বভাবের আদিমতম সৃষ্টি ছড়া। মানব সভ্যতার বিবর্তনের ঠিক কোন ধাপে ছড়ার আবির্ভাব ঘটেছিল তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও অনুমান করা যায় ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা জন্মানোর পর বিশ্বের মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশের ছন্দোময় কৌশল আবিষ্কার করে মুখে মুখে ছড়ার প্রচার করে। প্রথম সৃষ্টিকালীন পর্বে অধিকাংশ ছড়ার অন্তর্গঠনে অসংবদ্ধ ভাবনার যুক্তিহীন পাগলামি, আর বর্হিগঠনে মেলে ছন্দ ও সুরের নর্তনশীল আবেশ। যে কারণে ছড়ার কথক ও শ্রোতা উভয়েই মুগ্ধ হয় এর চিন্তাবর্জিত উচ্চারণভঙ্গির দুলুনিতে। বিপরীতে আধুনিক ছড়াকারদের ছড়ায় প্রতিফলিত হয় জ্ঞানের আদান-প্রদান। এই আদান-প্রদানের অনুসন্ধানের ফলে বেরিয়ে আসে সমাজগত, রাজনীতিগত অথবা ব্যক্তিগত কোন সংঘর্ষ, সমর্পণ অথবা উত্তরণের ছবি।

বিশ শতকে পৌঁছে আধুনিক শিক্ষিত কবিরা ছড়া রচনায় নতুন কল্পনা প্রকাশ করতে থাকেন। আসে বিভিন্ন চিন্তা ধারা, সংকেতবাহী চিন্তাপ্রবাহ। সংকেতবাহী আলোচনায় ছড়ার দেহস্থ নানা সংকেত কিভাবে সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে অর্থময় হয়ে ওঠে তা বোঝার প্রয়াস করা হয়। তবে ছড়া যেহেতু একধরণের সাহিত্য সে কারণে নৃতত্ত্বের দিকটাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

যে কারণে সামাজিক সংকেতগুলির বা প্রতীকগুলির নির্মান ও সংযোগের দিকটাও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়।

বিংশ শতাব্দীতে এরূপ বিবর্তনের কারণগুলির দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় এর পিছনে দুটি মূল কারণ —

(১) তুলনামূলকভাবে অত্যাধিক আধুনিক মনষ্ক ভাবনা
(২) বিংশ শতকীয় জটিল নাগরিক মন। যে কারণে ছড়ায় আসে বিভিন্ন বিবর্তিত রূপ। আর এই বিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়ে ছড়ায় যে দিকগুলি উঠে আসে সেগুলি হল মানব জীবনের শুরু থেকে অন্ত অবধি সম্ভাব্য সকল জীবন পর্বের অভিজ্ঞতার স্পর্শ।

এইভাবে নৃ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচ্য বিচার করতে গিয়ে ছড়ার মধ্যে প্রাক্ আর্য কৃষি সমাজের চিহ্ন যেমন পাওয়া যায় তেমনি পাওয়া যায় লাঙ্গল ব্যবহার করে কৃষিকাজের চেয়ে পুরানো জুম পদ্ধতিতে চাষের ছবি। অন্যদিকে উন্নত কৃষি সমাজের চিত্রও রয়েছে মুদ্রিত ছড়াগুলিতে। এইভাবে আপাত নিরীহ ছড়াগুলি বহন করে সমাজ বিবর্তনের চিত্র। এই সমাজ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ছড়াকারদের হাতে আধুনিকতার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি হওয়ার পেছনে কারণ গুলি হল —

(ক) যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বিংশশতকের ভাবনায় অতীত থেকে অনেক পরিমানে বেশি।
(খ) শিক্ষিত সাহিত্যিকদের সচেতন ও সুচিন্তিত ভাষা প্রয়োগ।
(গ) প্রয়োজন অনুসারে ভাষার সারল্য ক্রমশ কমেছে বা বেড়েছে।

ছড়ারচনাকারদের এই পালাবলদটিকে বলা যায় ‘পোশাকি’। আসলে উৎপাদন প্রক্রিয়া যেমন ধীরে ধীরে বদলায়, তার সঙ্গে তাল রেখেই বদলায় যেমন সংস্কৃতির ব্যবহারিক, বহিরাঙ্গিক রূপটি, কিন্তু মূলে অপরিবর্তিত থাকে তার অন্তর্নিহিত মানস-পরিকাঠামোটি ঠিক সেভাবেই ছড়ার ক্ষেত্রে বহিরাঙ্গিক দিকটি বদলালেও মূল অন্তর্নিহিত বিষয়টি এ কালেরই ছড়ার বিষয়। যে কারণে লৌকিক যুগের ছড়ার তুলনায় উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সাহিত্যিক ছড়াকারদের রচনাতে আধুনিকতার ছবি থাকলেও মূলত এগুলি আঙ্গিকগত দিক থেকে ছড়া।

এই আলোচনায় আমরা দেখাবো উনবিংশ- বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতার অগ্রগতিতেও সাহিত্যিক ছড়াগুলি কতটা প্রাচীন ছড়ার সহোদর। আমাদের বিচার্য দিকগুলি হল ঃ—

(১) উনিশ শতকের ব্যক্তিকবির রচিত ছড়াগুলি কি কি বিশেষত্বের কারণে ছড়া হয়ে উঠেছে?
(২) ছড়া হওয়া সত্ত্বেও কোথায় এগুলি প্রাচীন ছড়ার থেকে আলাদা হয়ে উঠেছে ব্যক্তি

কবি রচিত হওয়ার কারণে? অর্থাৎ একটু একটু করে কীভাবে ছড়াগুলিতে ব্যক্তিমনের প্রাধান্য ঘটেছে বিষয়গত দিক থেকে, ভাষাগত দিক থেকে?

(৩) এই যে একটু একটু করে উনিশ শতকের ছড়াগুলি আধুনিকতার দিকে যেতে থাকল এবং বিংশ শতকে এসে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমশ কোথায় কীভাবে অগ্রসর হয়ে ছড়ার স্বাদ বজায় রাখল ?

(৪) ব্যক্তিমনের গঠনানুযায়ী আধুনিক শব্দ ব্যবহারে প্রাধান্য বা যুক্তিগ্রাহ্যতা শব্দ ব্যবহারে আধুনিক চাকচিক্য বাড়তে থাকলেও কি কারণে এগুলি ছড়ার স্বভাবধর্ম বজায় রেখেছে?

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে আমাদের সমাজে বহুকাল পোষিত অনেক কুৎসিত ব্যাধির নগ্ন রূপ প্রকাশিত হয়। সমাজ থেকে এই সব ব্যাধি দূর করবার জন্য অনেক সমাজ সংস্কারকের আন্দোলন আমরা লক্ষ্য করি। মধুসূদন দত্তের প্রহসনে স্বরচিত এমন একটি ছড়া —

বাহিরে ছিল সাধুর আকার
মনটা কিন্তু ধর্ম - ধোয়া ।
পূণ্য-খাতার জাম শূণ্য
ভন্ডামীতে চারটে পোয়া ।।
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে,
হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া ,
যেমন কর্ম ফললো ধর্ম
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া ।। ৩

ছড়াটিতে আমরা দেখতে পাই একজন ভন্ড ধার্মিকের লালসার চিত্র। ভন্ড ব্রাহ্মণ ভক্তপ্রসাদের করুণ পরিণতি কী হতে পারে অর্থাৎ কু-কর্মের ফল তাকে কেমন ভোগ করতে হয়েছে তার কিলের চোটে খোয়ের মোয়ার মত হাড় গুঁড়িয়ে যাওয়ার বর্ণনায় তা ছড়ার অন্তর্কাঠামোয় জীবন্ত হয়েছে।

বসন্তকালে বাঙালী নারীরা শিবঠাকুরের ব্রত পালন করে থাকে। আজও বাঙালি সমাজজীবনে এই ব্রত আচরিত। বসন্তের কাক - কোকিলের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী রমণীরা জেগে উঠে ফুল সংগ্রহ করে মন্দিরে উপস্থিত হয়ে এই ব্রত পালন করে। আধুনিক নারীদের উপস্থাপিত এই ব্রত উনিশ শতকে দীনবন্ধু মিত্রের কলমে প্রকাশ পেয়েছে —

রাত পোহাল, ফর্সা হল,
ফুটল কত ফুল ।
কাঁপিয়ে পাখা, নীল পতাকা,
জুটল অলিকূল ।।
হেরে আলো, চোক্ জুড়ালো,
কোকিল করে গান ।।
ঘরের চালে, পালে পালে,
ডাক্‌চে কত কাক ।।
পূজা-বাটীতে, জোর কাটিতে
বাজ্‌ছে যেন ঢাক ।।
উঠে কূলে, এলো চুলে,
বসে সুলোচনা।
মাটি দিয়ে, শিব গড়িয়ে,
কচ্চে উপাসনা ।।
কানন হাতে, কচুর পাতে,
আনচে তুলে ফুল ।। ৪

শিক্ষা আনে চেতনা। শিক্ষার শিক্ষার বিকাশ বাস্তবে না ঘটলে সচেতন সমাজ গড়ে ওঠে না। একথা-আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন কার্যকরী ক্ষমতায়ন না ঘটলে সচেতনতার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় উনবিংশ শতকের আধুনিক কবির ছড়ার আঙ্গিকে—

যে জন দিবসে
মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতি,
আসুগৃহে তার
রবে নাকো আর
নিশীথে প্রদীপ ভাতি । ৫

ছড়া রচনা করতে গেলে সচেতন প্রয়াস যুক্ত হলে তাকে ছড়ার মর্যাদা থেকে নামিয়ে দেয়, কিন্তু অন্যদিকে ছড়ার মধ্যে সর্বজনীনতা থাকে, তাই ছড়া শুধুমাত্র শিশুদেরই নয় বড়দের এমনকি সকলেরই কাছে ছড়ার গুরুত্ব থাকে। ছড়ার মাধ্যমে বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয় পৌঁছে যায় আবাল-বৃদ্ধ -বনিতার মনে। যেমন —

''পারিব না '' একথাটি বলিওনা আর,
কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার।
পাঁচজনে পারে যাহা,
তুমিও পারিবে তাহা,
পার কি না পার কর পরখ তাহার,
একবার না পারিলে দেখ শতবার।
পারিবে না বলে মুখ করিও না ভার,
ও কথাটি মুখে যেন শুনি না তোমার।
অলস অবোধ যারা,
কিছুই পারে না তারা,
তোমায় তো দেখি না তাদের আকার,
তবে কেন 'পারিবে না' বল বার বার।
জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতার,
হাঁটিতে শিখে না কেহ, না পড়ি আছাড়,
সাঁতার শিখিতে হলে,
আগে তব নামো জলে,
আছাড়ে করিয়া হেলা হাঁট আর বার,
পারিব বলিয়া সুখে হও আগুসার। ৬

এখানে কেবল শিশু নয় সব বয়সের মানুষকেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই ছড়াটিতে আমরা দেখতে পাই শঙ্কর ভাষার বৈচিত্র্য, তুলনাত্মক চরণ প্রয়োগ। প্রাচীন ছড়ার মতো অসংলগ্নতা নেই কিন্তু একটি 'চিরত্ব' আছে।

শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি ছড়া দেখা যাক —

দাদামশার সাধের দাতি ফড়িংবাবু নাম।
চুয়াল্লিশ নাম্বার রসা রোড, ভবানীপুর ধাম
তালপত্রের সিপাই ভায়া লিকলিকে শরীর
চলেন যদি ওড়েন যেন পা দুটি অস্থির।
কি যে করেন, কোথায় যে যান হয় না সে নির্ণয়।
বুদ্ধিশুদ্ধি গজাবে যে হয়নি সে সময়;
লেখাপড়ায় মন বসে না, বইকে লাগে ডর।
পড়াশোনা শিকেয় তোলা কেবল খেলায় ভর,
বাড়ির লোকে পাগলপারা এক ফড়িং-এর চোটে,
কি হবে যে তাদের গতি আর এক যদি জোটে ? ৭

ছড়া চিরকাল ধরে শিশুদের মনোরঞ্জন করে আসছে। শিবনাথের ছড়াটিতে হাস্যরস প্রাধান্য পেয়েছে যা শিশুদের আকর্ষন করে। ফড়িংবাবু নামটি , তালপত্রের সিপাই, চলন যেন মনে হয় উড়ছে — এ সবই বালকচিত্তকে প্রভাবিত করে। দাদামশায়ের সাধের নাতির কথা শুনে তারা খুব খুশী হয়। এটি প্রাচীন ছড়ার স্বগোত্রীয় হলেও এই আধুনিক মুদ্রিত ছড়ায় কোন অসঙ্গতি নেই।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার ছোটদের জন্য একটি গল্প লিখেছেন, যেখানে পশুর বুদ্ধি এবং কৌতুক রসবোধ মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে হয়। যোগীন্দ্রনাথ লিখেছেন — ''কুকুরটির লেজ দোলানো আর কৌতুকভরা চাহনি দেখিলে বুঝিবে, সে এই 'বুড়ি-বুড়ি' খেলার রহস্য বেশ উপভোগ করিতেছে।''৮ (ছোটদের অমনিবাস — যোগীন্দ্রনাথ সরকার) এই সুত্রে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের বন্ধু প্রমদাচরণ সেন একখানি সুন্দর ছড়া উপহার দিয়েছেন —

ছেড়ে দাও না কুকুরচন্দ্র মায়ের কাছে যাই —
এখন কি আর খেলা করবার সময় আছে ভাই?
দেখছ না কি হাঁড়ি হাতে,
চাল রয়েছে ধোঁয়া তাতে —
মা বলেছেন নিয়ে যেতে চাকর-বাকর নাই।
কাজটি সেরে ফিরে এলে,
তখন তোমায় আমায় মিলে —
মনের সুখে করব খেলা যত ভেবে পাই।
কাজ ছেড়ে না করব খেলা,
ছেড়ে দাওনা হল বেলা —
আগে কাজ কি আগে খেলা জানতে আমি চাই। ৯

এই আধুনিক ছড়ায় প্রকারান্তরে শিশুশিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

শিশুদের বিস্ময়কে উস্কে দিয়ে যাঁরা এগিয়ে আসেন, সেইসব ছড়াকারদের মধ্যে স্বনামধন্য ছড়াকার সুকুমার রায়ের পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর প্রসঙ্গ আনতেই হয়। তিনি তাঁর ছোটদের জন্য একটি রচনায় 'খুকুমনিকে যে ভাবে সাজিয়েছেন এবং সেই খুকুর মুখের ভাষায় তার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা পড়তে গিয়ে যে কাউকেই তোতলা হতে হয়। এই ছড়াটি শুধুমাত্র শিশু নয়, সকলেরই পড়তে এবং শুনতে ভালো লাগে। ছড়াটি এইরকম —

এই যে আমাল থোনাল বালা, থ্যাকলা দিল গলে,
লাঙ্গ তুলি থিল হাতে, খেলতে গেল পলে।
নিজে হাতে তিপ পলেথি, কলে আঙ্গুল দিয়ে,
থোও কাকাল দোয়াত থেকে কালি তুলে নিয়ে।
দেক আমাল কেমন কাপল মা দিয়েথে ভাই,
ধূলোল উপল বথব নাকো, নোংলা হবে তাই।
দিদি দিল লাল ফিতা বেঁধে আমাল তুলে,
তাই তো আমাল তুল এথেথে তোখেল উপল তলে,
দাদা বলবে নোংলা মেয়ে নেবে আল কোলে।
থবি আমি কলতে পালি, তোমলা দেখ বথে,
এক্ষুনি তুল থিক কলে দি, বুলুথ দিয়ে ঘথে।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (খুকুমনি)

এই ছড়াটিতে ব্যবহৃত শব্দ 'আমাল', 'থোনাল', 'তিপ', 'পলেথি', 'কলে', 'দিয়েথে', 'ধুলোল', 'বথব', 'নোংলা', 'তোখেল', 'কলতে' — এগুলি সবই ছোটদের মুখে শুনতে খুব ভালো লাগে। আবার মাতৃস্থানীয়রা যখন শিশুদের কাছে এই ছড়াগুলি শোনায় তখন শিশুদের কাছে এগুলি খুবই আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। সুতরাং ছড়ার যে সহজ কাব্যরস তা এখানে স্পষ্ট।

বাংলা শিশুসাহিত্যের চালচিত্রে যিনি আমূল পরিবর্তন ঘটালেন তিনি হলেন ''হাসিখুসি''র লেখক যোগীন্দ্রনাথ সরকার। তাঁর সংকলন 'খুকুমণির ছড়া' তাঁকে শিশুরাজ্যে সু-প্রতিষ্ঠিত করে। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন — '' শিশুর মন তিনি সহজেই বুঝতেন — তাঁর নাড়ির টানই ওদিকে ছিল, আর সেই সঙ্গে রুচি ছিল নির্ভুল, রচনাশক্তি যথাযথ — যেটুকু হলে সংগত হয় সেইটুকুই , তার কমও না বেশিও না। তাই তাঁর প্রতিটি বই ঠিক তা-ই, অতি তরুণ পাঠমালার যা হওয়া উচিত — আগাগোড়া শৈশবের রসে সবুজ, একেবারে কিশলয়ের মতো কাঁচালেখায় যেটুকু কাঁচা ভাব আছে, অপটুতা আছে তাও তার স্বাদের একটি উপকরণ, ওর চেয়ে পাকা হাত হলে সে হাতে অমন তার উঠতো না। ..... যোগীন্দ্রনাথের রচনা একান্তভাবে অন্তঃপুরের, — স্কুলের নয়, পাঁচজনকে ডেকে শোনাবার মতোও নয় , যেন মা- ছেলের বিশ্রম্ভালাপের ভাষা - ঠিক তেমনি স্নিগ্ধ - কোমল, সহাস্য তাঁর গলার আওয়াজ।''১০ (বাংলা শিশুসাহিত্য)

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের বিখ্যাত '' মজার মুল্লুক '' নামক ছড়াটি শিশুদের বড়ই প্রিয় —

এক যে আছে মজার দেশ,
সব করমের ভালো,
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ,
দিনে চাঁদের আলো !
আকাশ সেথা সবুজ বরণ,
গাছের পাতা নীল;
ডাঙায় চরে রুই কাতলা
জলের মাঝে চিল !
সেই দেশেতে বিড়াল পালায়
নেংটি ইঁদুর দেখে;
ছেলেরা খায় 'ক্যাস্টার-অয়েল'
রসগোল্লা রেখে !

এই মুল্লুকের ঘটনাগুলি সবই আমাদের বাস্তব জগতের উল্টো। কিন্তু এতে আছে হাস্যরসের ফল্গুধারা। শুধুমাত্র শিশু মন-ই নয়, এরকম উদ্ভট ঘটনা বড়দেরও আনন্দ দেয়। অর্থাৎ ছড়ার নান্দনিক দিকটি এখানে পরিস্ফুটিত। আপাত অর্থে আমরা দেখতে পাই এটি একটি ছড়া। ছড়া মূলত মনোরঞ্জনের প্রতিভাগত মহৎটান। উনবিংশ শতাব্দীতে যোগীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর রচনায় লৌকিক ছড়ার তুলনায় অনেকটাই মস্তিষ্ক প্রসূত করে তুলেছেন। — বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে নামযুক্ত জীব জন্তুরা। এদের নিয়ে রচিত ছড়াগুলি শিশুদের টানে বেশি। এরা শিশুদের স্বভাবযুক্ত হয়ে ছড়ায় উপস্থিত হয়েছে।

বনেতে এক শিয়াল আছে,
নামটি শিবু তার;
দুষ্টুমিতে পাকা তেমন
নাইকো কেহ আর
যখন তখন দিনে রেতে
ঢুকে লোকের ঘরে,
ছাগল, ভেড়া, পাখির ছানা
খায় সে চুরি করে। (যোগীন্দ্রনাথ সরকার, শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত দুষ্টু শিবু)

আসলে শিশুমনের প্রতি যোগীন্দ্রনাথের ছিল প্রতিভাগত সহজ টান। শিশুদের আকৃষ্ট করতে তিনি তাঁর সৃষ্ট রচনায় নিয়ে এসেছেন স্বচ্ছন্দ রঙ আর ধ্বনি। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের ছড়ার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ঘরোয়া পারিবারিক প্রত্যক্ষভঙ্গি, যা ছোটদের অনেক বেশি নিজস্ব। তাঁর সংগৃহীত লৌকিক ছড়াগুলি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ।

নূতনের উদ্ভব যেমন সামাজিক পরিবর্তনের একটি দিক, তেমনি পুরাতন ধারার ক্রম বিবর্তনও সামাজিক পরিবর্তনের অন্য একটি দিক। এই দ্বিবিধ স্রোতের মাঝখানে বাংলা ছড়াকে ধারাবাহিক ক্রম দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছে। শিশুদের জন্য তিনি তিনখানি ছড়ার বই লিখেছিলেন — (১) ''খাপছাড়া'' (২) ''ছড়ার ছবি'' (৩) ''ছড়া''। এদের মধ্যে প্রচলিত লৌকিক ছড়ার নিদর্শন মেলে 'খাপছাড়ায়'। 'ছড়ার ছবি'র ছড়াগুলি চিত্রসমৃদ্ধ এবং গল্পের ঢঙে লেখা। 'ছড়া'র অন্তর্গত রচনাগুলিও মজার রসে পরিপূর্ণ, তবে তার আকৃতি নেহাৎ ছোট নয়। শিশুদের জন্য রচিত তাঁর 'খাপছাড়া'য় ছোট ছোট মজাদার অনেক ছড়ার নিদর্শন মেলে। একটি ছড়া এরকম —

ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির,
পাঁচবোন থাকে কালনায়,
শাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়,
হাঁড়িগুলো রাখে আলনায়।
কোন দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তারা লোহা সিন্দুকে,
টাকা কড়িগুলো হাওয়া খাবে বলে
রেখে দেয় খোলা জানলায়,
নুন দিয়ে তারা ছাঁচি পান সাজে
চুন দেয় তারা ডালনায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ি)

ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির পাঁচ বোনের অসংগত উদ্ভট আচরণ চমৎকারভাবে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন, যে এনিয়ে কারও কোনো প্রশ্ন জাগে না। অপূর্ব মিলের বিন্যাসে ছড়াটি সব বয়সের চিত্তকেই আকৃষ্ট করে। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বিচিত্র স্থান নাম, মানুষের নাম পদবী এবং মানুষের উদ্ভট ও মজাদার স্বভাব। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় এত উদ্ভট সব ভাবনাই তাকে শিশুর মনরাজ্যে স্থান দিয়েছে।

শব্দের দ্বারা নির্মিত ছড়াগুলি শিশুদেরকে অতিক্রম করে বড়দেরও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। নিজ নির্মিত শব্দ সহযোগে লেখা 'খাপছাড়া'র একটি মজাদার ছড়ার নিদর্শন দিয়ে বিষয়টি দেখানো যায়। যেমন —

শুনব হাতির হাঁচি
এই বলে কেস্টা
নেপালের বনে বনে
ফেরে সারা দেশটা।
শুঁড়ে সুড়সুড়ি দিতে
নিয়ে গেল কঞ্চি
সাত জালা নস্যি ও
রেখেছিল সঞ্চি।
জল কাদা ভেঙে ভেঙে
করেছিল চেস্টা,
হেঁচে দু হাজার হাঁচি
মরে গেল শেষটা।

(খাপছাড়া, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৯ নং কবিতা, পৃঃ ৪৫৩) ৩য় খন্ড।

এইভাবে হাতির হাঁচির মতো বিরল জিনিষ খুঁজতে গিয়ে কেস্টা অনেক চেস্টাই করেছিল, কিন্তু একটা দুটো নয়, নিজে সে দু-হাজার হাঁচি হেঁচে প্রাণ হারাল অবশেষে। আর তার এই কান্ডে শ্রোতা ছেলেমেয়েদের হেসে প্রাণ হয়ে ওঠে প্রসারিত।

'খাপছাড়া'র বহু ছড়ার মধ্যে এরকম হাস্যরস ছড়িয়ে আছে। যদিও এতে ব্যবহৃত হয়েছে ছোটোদের দুর্বোধ্য প্রচুর শব্দ, কিন্তু তার অর্থ নিয়ে ছোটরা মাতামাতি করে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছড়ার ছবি'তে বলেছেন, — ''এর মধ্যে জটিল যদি কোনোটা থাকে তবে তার অর্থ হবে কিছু দূরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়।'' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছড়া'র ছবির ভুমিকা, আশ্বিন ১৩৪৪)। সত্যিই কাব্যটির প্রত্যেকটি ছড়ার ধ্বনিতে আশ্চর্য মিলের জাদুতে শুধু ছোটরা কেন, বড়োরাও অভিভূত হয়ে যায়। ''এক রবীন্দ্রনাথ বলেই এত বেশি মিলকে সামলে দিতে পেরেছেন এত বেশি কবিতায় এবং সচেতন এবং মনস্ক নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও কতকগুলি কবিতা শিশু- অশিশু নির্বিশেষে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।'' ১১

উনিশ শতকের একজন বিস্মৃতপ্রায় স্বনামধন্য সাহিত্যিক কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত। তাঁর একটি অবিস্মরণীয় ছড়া —

এক যে ছিল রাজপুত্তুর বয়স হবে ষাট।
মনের মত কনের খোঁজে চলল রানাঘাট।
ঘুঘুডাঙায় গিয়ে দেখে সেই পথে কে যায়।
পাল্কি চড়ে ঘাঘরা পরে আলতা দেয়া পায়।

রাজপুত্তুর বলল ডেকে ওগো রাজার ঝি।
একটু থাম যাও শুনে যাও আমার কি আরজি।
তারপরে সে রাজার ঝিয়ের সামনে গিয়ে দেখে।
— ওমা! এ কোন ষষ্ঠীবুড়ি - চুল গিয়েছে পেকে!

রাজপুত্রের দিক চেয়ে বুড়িও অবাক!
কোনদেশী এ রাজার ছেলে মাথায় দেখি টাক। ১২

ষাট বছরের বুড়োর অবস্থা এবং ষষ্ঠীবুড়ির অবস্থার বর্ণনা এখানে এক মজার গল্পের মতন মনে হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' যেমন তৎকালীন সমাজের একটি নিদর্শন এখানে ছড়াটিতে একই চিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে তেমনই। কিন্তু আসলে এই দৃশ্যটিকে ছড়ার আকারে দেখানো হয়েছে। ছড়া শুনতে ভালো লাগে তার সুর ও ছন্দের জন্য, উপরন্তু তাতে যদি এরকম হাস্যরসাত্মক উপাদান থাকে। সুতরাং একজন শিক্ষিত কবির দৃষ্টিভঙ্গির যতই পরিবর্তন হোক না কেন, তাঁর ভাষার পরিবর্তন হোক না কেন, — আসলে এর মধ্যে লৌকিক ছড়ার অন্তর্নিহিত অর্থের নির্যাস রয়েছে। সে কারণেই এগুলি মূলত ছড়া।

এরপর আসা যাক, বিংশ শতকের ছড়া রচয়িতাগণের কিছু ছড়ার নমুনায়। বিংশ শতকের তিনের দশকে অসাধারণ ছড়াকার ডঃ সুকুমার রায়। তাঁর ছড়ার মধ্যে হাসির রংমশাল দেখা যায়। ভাষার কারসাজিতে তিনি সৃষ্টি করেছেন হাঁসজারু, বকচ্ছপ, হাতিমি ইত্যাদি কাল্পনিক ছবি। তাঁর ''আবোল তাবোল'' নামক গ্রন্থের প্রত্যেকটি সৃষ্টি অসঙ্গতির রসে পরিপূর্ণ যা শিশুদের নানা মজার হাসির জগৎ উপহার দেয়। এছাড়া তাঁর অদ্ভুত চিন্তার ফসল 'শব্দ-কল্প-দ্রুম'' গ্রন্থের অফুরন্ত হাসির ঝুড়ি —

ঠাস ঠাস দ্রুম দ্রাম্ শুনে লাগে খটকা —
ফুল ফোটে? তাই বল! আমি ভাবি পটকা!
শাঁই শাঁই পনপন, ভয়ে কান বন্ধ —
ওই বুঝি ছুটে যায়, সে ফুলের গন্ধ?
হুড়মুড় ধুপ্‌ধাপ্ - ওকি শুনি ভাইরে!
দেখছ না হিম পড়ে — যেও নাকো বাইরে!
চুপুচাপ ঐ শোন্ ! ঝুপঝাপ ঝ-পাস!
চাঁদ বুঝি ডুবে গেল? গব্ গব্ গ-বাস! ১৩

আলোচ্য ছড়াটিতে দেখা যায় যে সব ক্রিয়ার কোন শব্দ নেই, তাকেই তিনি শব্দে সাজিয়ে বড়দের মজার রসে ভাসিয়েছেন, শিশুদের করেছেন বিস্ময়ান্বিত। নিঃশব্দে যে কাজ সম্পাদিত হয়, সেইসব কাজকে শব্দের দ্বারা ধ্বনিত করার কল্পনা তাঁর আগে হয়তো কেউ কোনোদিন করতে পারেন নি। এজন্যই তাঁর লেখা উদ্ভট। অনেকটা লৌকিক ছড়ার মত।

বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র আর এই প্রতিভাধর ছড়াকার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপহার দিয়েছেন ছোটদের সেই নিজস্ব জগতের ছবি। সেই ছেলেভুলানো ছড়ার স্টাইল এ যুগকে উপহার দিয়েছেন তিনি। তাঁর লেখা একটি ছড়া —

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
বাজছে বাদল গামুর গুমুর
ডাল চাল আর মক্কা মুসুর
ফোঁটায় ফোঁটায় নামে —
আকাশ থেকে নামে —
জলের সাথে নামে —
ঘরে ঘরে নামে —
টাপুর টুপুর গামুর-গুমুর
গামুর গুমুর টাপুর-টুপুর। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বৃষ্টি পড়ে)

মেঘের জলের সঙ্গে মকা মুসুর প্রভৃতি শস্যগুলি নামার মধ্যে দিয়ে এক কল্পলোকের উপভোগ্য ছবি তুলে ধরেছেন ছোটদের সামনে। তিনি এই ছড়ার মাধ্যমে পুরো একখানি চিত্রের যেন সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এই ছড়া থেকে একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় — ছেলে ভোলানো হচ্ছে একটানা একটা সুরে কতকগুলো কথা ক্রমাগত আউড়ে গিয়ে শব্দগুলির আওয়াজ একটি শব্দের সঙ্গে আরেকটির সম্পর্কহীনতা। তবুও যেন মনে হয় কোথাও না কোথাও একটা অপূর্ব সুরের সমাবেশ ঘটেছে কতকগুলি শব্দের মাধ্যমে, যা ছড়ার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। মূলের অন্তকাঠামোটি একটি ছড়া। তাই বলা যায় এগুলি শিক্ষিত সাহিত্যিকদের হাতে রচিত হলেও মূলে রয়েছে লোকসাহিত্যের পুনর্ভাবনা।

নবজাগরণের যুগে সমাজের তাগিদে নতুন নতুন ভাবে উদ্ভাবিত হয় এবং তার ঘাত-প্রতিঘাতে ধীরে ধীরে পুরাতনের সঙ্গে নতুন ধারার মিশ্রণ শুরু হয়। নতুন — পুরাতন উপাদানের মিলন-মিশ্রণের ভিতর দিয়ে নতুন নতুন ভাবে তৈরী হয়। ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অপূর্ব ছন্দ চয়ন করে নতুন রচনারীতির সৃষ্টি করেন, যাতে
লোকায়ত ছেলেভুলানো ছড়ার নতুন আমেজ পাওয়া যায়। তাঁর একটি রূপ —

কম্‌লা -ফুলি কম্‌লা ফুলি! কমলা লেবুর ফুল!
কম্‌লা ফুলির বিয়ে হবে কানে মতির দুল!
কমলা -ফুলির বিয়ে
দেখতে যাবে, ফলার খাবে চন্দনা আর টিয়ে !

ভাষা আর ছন্দের উপর অসাধারণ আধিপত্যে সত্যেন্দ্রনাথ সহজেই সৃষ্টি করেছেন শিশুদের ভোলাতে এ ধরণের ছড়া। লৌকিক ছড়ার মতো যাবতীয় লক্ষণ এই ছড়ার মধ্যে আছে। কিন্তু লৌকিক ছড়ার তুলনায় এখানে ভাষা, শব্দ, ছন্দ ইত্যাদির ওপর একটি সচেতন মনের প্রয়াস ঘটেছে।

মূলত কথাসাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ছেলেভুলানোর জন্য ছড়া রচনায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ছোটদের উপহার দিয়েছেন '' ছবি ছড়ার দেশে'' ছবি ও ছড়ার মধ্য দিয়ে ছোটদের আকর্ষণের মন্ত্র তিনি জানতেন, তাই লিখে ফেললেন, হিংসুটে দুজনের কথা —

হিংসুটে হিংসুক
কারু মনে নেই সুখ
এর যদি নাম হয়।
ওর তবে ঘাম হয়;
ও যদি টাকা পায়
জ্বলবে এ কাটা ঘায়
.....
এর গরু দড়ি ছুট
দিচ্ছে ও হরি লুট;
ওর পাখি খাঁচা- খোলা
ঝুসিতে এ কাছা - ভোলা।
এর যদি মরে বউ।
খাবে ও যে চৌ চৌ;
ওরো বউ যদি মরে,
তবে দুয়ে ভাব করে।

আশুতোষ ভট্টচার্য্যের সাহিত্যিক ছড়া,
লোকসাহিত্য ২য় খন্ডের অন্তর্গত, ১৯৬৩, পৃঃ ৬৭৯

হিংসুটেদের মনের কথা এত সহজে প্রকাশ করে এরকম মজার ঢঙে লেখা ছড়াটি অতি সহজে ছোটদেরও অভিভূত করে তোলে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত সামাজিক, রাজনৈতিক, জলবায়ুও বিশৃঙ্খলা দেশের মানুষকে বিকৃত ও কলুষিত করে তুলেছিল। সেই সময়কার শিথিল স্বৈরাচারী মনোবৃত্তি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। তখনকার টপ্পা, পাঁচালী, খেউড় প্রভৃতি কবিতা তার সাক্ষ্য বহন করে। বিকৃত রসলিপ্সু সমাজ ওই সব সাহিত্য থেকে প্রচুর আনন্দ লাভ করত। এই রকমারি লোকসাহিত্যের একটি প্রধানতম শাখা ছড়া, যার মাধ্যমে জনগণ বিভিন্ন ধরণের আনন্দ লাভ করে। লৌকিক ছড়াতে যেহেতু রুচি বিকৃতি ঘটত না তাই উনিশ শতকের শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চার পাগলামি ছড়া রচানতেও কবিরা উৎসাহিত হতে থাকেন। বিশ শতকে সেই প্রবাহ আরও গতি পায়। বিভিন্ন আদলে পরিবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়। হেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত একটি এরকম ছড়ার অংশ —

কে সদরে নাড়ছে কড়া এখন রাত্রি দুপুরে?
কে ধরবে ইলিশ-ছানা উনিশ বিঘে পুকুরে?
অশোকবাবু? আসুন আসুন ! আসন পেতে আসুন দি,
অমন করে গোসলখানায় খাবেন না আর কাসুন্দি!
রসগোল্লার গোল্লা খতম, রস যে পড়ে চলকে।
বটুকবাবু গুড়ক টানেন, নেই যদি ও কলকে।
কে নাচেরে মৌমাছি নাচ, সুধীরবাবুর আসরে?
কে বাজায়বে ওস্তাদি-সুর ভাঙা ফাঁটা কাঁসরে?
গদায় ভায়া পদ্য লিখে সদ্য পাঠায় ''মৌচাকে'',
তাই পড়ে আজ ধরল মাথা, তাই ঘোষেদের বৌ হাঁকে।
ভট্ট সতীশ ডাকাচ্ছে নাক, স্তম্ভিত মাস পয়লা
গরুগুলি তুলল পটল, খাচ্ছে যে ঘাস গয়লা।
মশার জ্বালায় জ্বলে পুড়ে কলের কামান দাগাচি,
শব্দ শুনে ভিরমি গেল শ্রী অপূর্ব বাগচী। হেমেন্দ্র কুমার রায় (প্রলাপ ছড়া)

ছড়াটির ঘটনাগুলি পড়ে সত্যিই যেন মনে হয় কোনো প্রলাপোক্তি। লেখক এখানে বিশেষ কিছু উদ্ভট, অসঙ্গতির দিকগুলি এমন সুন্দর সহজভাবে তুলে ধরেছেন, যেখানে হাসির অন্ত থাকে না। এমন ঘটনা শুনলে বা পড়লে শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই হাসবেন। ছড়াটির ভাষা সহজ সরল, ঘটনা বিচিত্র ছন্দ, সুর অপূর্ব। লৌকিকছড়ার মতন অসঙ্গতি দেখি একজন শিক্ষিত নাগরিক কবির হাতে। এখানেই লৌকিক ছড়ার সঙ্গে বিংশ শতকের রচয়িতার পার্থক্য বিদ্যমান। আধুনিক কবি অবলীলায় তৎসম শব্দ 'রাত্রি'র পাশে তদ্ভব 'দুপুর' শব্দটি বসিয়েছেন। 'ওস্তাদি', 'কামনা', 'গোসলখানা' ইত্যাদি আগন্তুক শব্দও এনেছেন। এভাবেই প্রাচীন গ্রামীন ছড়া আধুনিক কবির হাত ধরে নগরে হাজির হলো।

ছড়ার মধ্যে রূপকথার পরিবেশ ও জীবনের আনন্দ বেদনার উভয় প্রকার রস পরিবেশিত হয়ে আত্মীয়তা স্থাপন করে। এর অন্যতম পথিকৃত সুনির্মল বসু, যিনি ছিলেন ছোটদের নয়নের মণি। হাসির দেশের রাজার ছড়া রচনার প্রেক্ষিতে সমাজে তাঁর ''আমার ছড়া'-র ভূমিকায় বলেছেন —''আমার মনে হয় ছড়া লেখা সহজ নয়। ছড়া লিখিবার রীতি নীতি ও পদ্ধতী সাধারণ রচনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ..... ।'' ১৪ (সুনির্মল বসু, আমর ছড়ার ভুমিকা)। সহজেই ছন্দের দোলায় তিনি শিশুদের মন কেড়েছেন। তাঁর ছড়া যেন গড়ের মাঠে 'গড় গড়িয়ে যাবার মত।' যেমন —

ভাগলপুরের ছাগল হটাৎ
পাগল হয়ে যায়
শিঙ বাগিয়ে লাগায় তাড়া
সামনে যারে পায়।
কাঁকুড়গাছির ঠাকুরদাদা
আনছে কিনে ডিমের গাদা
এমন সময় ছাগল তেড়ে
গুঁতিয়ে দিল তায়
ঠাকুর দাদা গড়িয়ে পড়ে
ডিমগুলো সব ছড়িয়ে পড়ে
ডিমের রসে ঠাকুরদাদায়
চেনাই হল দায়। ১৫

মা-ঠাকুমার মুখে শোনা মধু ঝরানো ছড়াগুলিই সুনির্মল বসুকে প্রেরণা জাগিয়েছিল ছোটদের জন্য লিখতে। কত অবাক বিস্ময়বোধ ছড়িয়ে আছে তাঁর লেখায় —

কালকে রাতে তালতলাতে গালফোলা এক বুড়ি,
গাছের থেকে খাচ্ছে পেড়ে গরম গরম মুড়ি।
একটু দূরে তালপুকুরে জাল ফেলে এক ছেলে -
নরম মিঠে গোকুল পিঠে অনেকগুলো পেলে। ১৬

উদ্ধৃত ছড়াগুলির অংশবিশেষ থেকে বোঝা যায় এ যেন স্বপ্নরঙীন সৌন্দর্যের তিলোত্তমা। তাঁর ব্যক্তিগত কত মধুর অভিজ্ঞতা এই ছড়ার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে লেখা এই ছড়াগুলি কখনোই লৌকিক ছড়া থেকে দুরে অবস্থান করেনি। ভাষা, ছন্দের মাধ্যমে শুধু হয়ে উঠেছে সহজ সরল সরস কৌতুক গুচ্ছ। আদি লগ্নের অলিখিত ছড়ায় যে সকল বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে তার সকল গুনই প্রায় এখানে রয়েছে। হয়েছে শুধু পোশাকী পরিবর্তন।

সুনির্মল বসুর মত আর ও একজন ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন শ্রেণীর ছড়া লিখে শিশুদের মনোরঞ্জন করেছিলেন। তিনি হলেন সুখলতা রাও। 'সন্দেশ' পত্রিকায় শিশু সাহিত্য ও ছড়া রচনায় তাঁর হাতে খড়ি হয়। তারপর 'সন্দেশ' ছাড়াও বহু পত্রিকায় লেখেন এবং ছোটদের ছড়া সঞ্চয়নও প্রকাশ করেন। তাঁর একটি ছড়া উল্লেখ করলেই বোঝা যায় ছড়ার সঙ্গে রূপকথার অপরূপ যুগলবন্দী। যেমন—

দিঙ্‌নগরের বুড়ী এল, তিনটি মেয়ে মুঠোয় ধরে,
একটি সেঁকে; একটি বাড়ে
একটি ভাল রান্না করে
মিহি সুতো কাটতে পারে,
ঘরের কাজও কাটতে পারে,
ও গিন্নি মা, কিনবে নাকি
একটি মেয়ে, আদর করে?

সুখলতা রাও
(আশুতোষ ভট্টচার্য্যের সাহিত্যিক ছড়া
লোকসাহিত্য, ২য় খন্ড)

এই ছড়াটি লৌকিক ছড়া 'এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান/এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান।'' এটির রচয়িতার নাম জানা যায় না। রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত ছড়া থেকে প্রাপ্ত ছড়াটির একই রূপ। এখানে দিঙ্‌নগরের বুড়ীর নাম উল্লেখ করে মোটামুটিভাবে একটি পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লৌকিক ছড়ায় সে পরিচয়টুকু আমরা পাই না। আসলে এখানে মূল বিষয় প্রাচীন সমাজে নারীদের অবস্থান কেমন ছিল তার দৃষ্টান্ত যেমন দেওয়া হয়েছে, তেমনি ঊনবিংশ - বিংশ শতাব্দীতে একটি বিশেষ দিকের নির্দেশ করে ছড়াটি রচিত। একজন নারীর পাত্র পক্ষের উপযুক্ত করে বিবাহ দেওয়ার এবং তাঁর কর্মের যে কতখানি কদর তা বোঝানোর জন্য তিনটি মেয়ের পরিচয় দেওয়া হয়েছে গিন্নী মাকে খুশী করার জন্য। এখানেই লৌকিক ছড়ার সঙ্গে যেটুকু তফাৎ। মূল বিষয় একই, দুটি সময়ের ব্যবধানের। দুটি পদ্ধতিতে ছড়া দুটি রচিত হলেও মূলত এগুলি ছড়া।

বিশ শতকের আরেকজন সাহিত্যিক প্রথম চৌধুরীর কবিমনকেও নাড়া দিয়েছিল ছোটবেলায় মা-ঠাকুমাদের কাছ থেকে শোনা ছড়াগুলি। যার প্রভাবে তাঁর মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভুত হয়েছিল বিভিন্ন শ্রেণীর ছড়া। উদ্ভট আবোল তাবোল ছড়া, তাঁর ভাষাও উদ্ভট, যেখানে দেখা যায় হাসির ব্যাপক প্রভাব। ছড়াগুলি শুনে বা পড়ে শিশুরা গড়াগড়ি যায়। একটি উদাহরণ তুলে ধরলে বিষয়টি বোঝা যায়। ছড়াটি এইরকম —

ছোটং ছেলে খেলেং পান ।
বড়ং লোকে মলেং কান ।।
টুপিং যেন্নি ফেলেং খুলে ।
পেত্নীং অন্নি ধরেং চুলে ।।
ছোটং ছেলে বেশীং কাঁদে ।
ভূতং তাহার চাপেং কাঁধে ।। প্রমথ চৌধুরী (চাণক্য শ্লোককাস্টক)

এই ছড়াটির কৌতুকরস ছোটদের ভীষণভাবে আনন্দ দেয়। এখানে ভাষার আঞ্চলিকতা যেমন চোখে পড়ার মতো, ঘটনার কাহিনীও তেমনি হাস্যরসের। শিশুরা যখন ঘুমোতে চায় না মা তখন ঘুমপাড়ানি ছড়া শুনিয়ে তাকে যেমন ঘুমোতে বলে আবার ছোট শিশুর দুষ্টুমি যখন কিছুতেই বন্ধ হতে চায় না, তখন বিভিন্ন উপায়ে তার মনের মধ্যে ভয় সঞ্চার করা হয়। ছোট শিশুর যখন কান্না থামতে চায় না তখন তাকে বিভিন্ন রূপকথার গল্প শুনিয়ে যেমন ভীতির সঞ্চার করা হয় ঠিক তেমনি ছড়া কেটে ভূতের পরিচয় দিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত করা হয়। আধুনিক যুগের লেখক হয়ে প্রথম চৌধুরী এরকমই একটি ছড়া লিখেছেন, যেখানে ভাষার ব্যবহারে লৌকিক ছড়ার থেকে তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। এখানেই আধুনিক মনস্কের লক্ষণ ছড়াতে ধরা পড়ে।

আধুনিক সাহিত্যিকদের অনেকেই ছড়া রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। আশা দেবী এরকমই একটি নাম। ছোটদের জন্য তিনি লিখেছিলেন 'নীল তারা নীল তারা', 'ঘুমতি নদীর ঢেউ' প্রভৃতি ছড়ার বই। তিনি 'নীল তারা নীল তারা' নামে গ্রন্থটির মধ্যে অন্তর্গত ছড়ায় যে অসম্ভাব্যতার রঙটি লাগিয়েছেন তাতে ছড়ার বৈশিষ্ট্যগুলি সার্থক ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। আবার তাঁর বই গুলিতে লৌকিক রঙও বিরল নয়। তাঁর 'ঘুমতি নদীর ঢেউ' নামক গ্রন্থের 'শেষের গান' ছড়াটিতে বাঙালীর চির পরিচিত গল্পরসের পংক্তি দিয়ে রচনা শুরু করে মনোরম স্বপ্ন জগতের ছবি এঁকেছেন। যেমন —

কথা গেল ফুরিয়ে
নটে গাছ মুড়িয়ে
খোকনকে খেতে দেই
ঘন দুধ জুড়িয়ে
ওই চাঁদ উঠলো,
বনফুল ফুট্‌লো,
ঘুম পরী নামে চোখে
নীল পাখা উড়িয়ে।
চাঁদ মুখে চুমো
খোকা ঘুমো ঘুমো আশা দেবী (শেষের গান)

এ ধরণের ছবি, খোকাদের ভোলাতে বাঙালি ঘরের মায়েরা যে উপহার দিয়ে থাকেন, তা আমরা ছেলেভুলানো ছড়ায় দেখতে পাই। যেমন —

হাটের ঘুম, মাঠের ঘুম,
গড়াগড়ি যায়;
চার কড়া দিয়ে কিন্‌লুম ঘুম
খোকার চোখে আয়।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার (সংকলক)
(খুকুমণির ছড়া)

এই ছড়াটির সঙ্গে আশা দেবীর আধুনিক ছড়াটির সামঞ্জস্য চোখে পড়ার মতো। কিন্তু ভাষাগত দিক থেকে লৌকিক ছড়ার তুলনায় আধুনিক।

এযুগের লেখক সত্যজিৎ রায়ও মজার ছড়া ও লিমেরিক ছড়া লিখেছেন। যদিও তাঁর বেশীরভাগ রচনাই গভীর ও পরিপূর্ণ, তবুও সুকুমার রায়ের সন্তান হিসেবে হাস্যরসের একটি ধারা তাঁর ছড়াতেও প্রবাহিত। তাঁর সৃষ্ট হাস্যরসাত্মক একটি লিমেরিক হল —

রাম ফাকিবাজ চাকর জোটে সাধনবাবুর ভাগ্যে,
বাবু বলেন, রোবট রাখি, চাকরগুলো যাক গে।
রোবট হল কাজে বহাল
তার ফলে আজ বাবুর কি হাল?
রোবট বলে, 'কইরে ব্যাটা? বাবু বলেন আজ্ঞে? ১৭

আলোচ্য ছড়াটি আধুনিক ভাবনার দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত। এখানে ছড়ার মাধ্যমে বাবুর চাকরের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। যেটি ছড়া হলেও মূল বিষয়ভাবনা আধুনিক দৃষ্টির পরিপন্থী।

এ যুগের আরেকজন বিখ্যাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু খেয়াল-খুশির হাল্কা হাসির স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ছড়াতে। তাঁর রচনার খাপছাড়ার অসম্ভব ভাবনা শিশুমনে দোলা দেয়। তাঁর ''বারো মাসের ছড়া'' এরকম দৃষ্টান্তের নজির। তাছাড়া বহুছড়ায় খেয়ালীপনা কৌতুকরসের সন্ধান দেয়। যেমন —

এক যে ছিলেন বড়বাবু বেলতলাতে,
ফুটপাতে তাঁর দেখা হল বাঘের সাথে।
বাঘ বললে, 'হালুম'!
বাবু বললেন, 'গেলুম'
দুদিন বাদে বাঘ মরল কলেরাতে। ১৮

ছড়াটিতে একটি আজগুবি ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। ছড়াটি শুনে শিশুরা তো আশ্চর্য হবেই আবার তার সঙ্গে এ ধরণের আজগুবি ঘটনা বড়দের মনেও নাড়া দেয়। সুতরাং লৌকিক ছড়া যেমন শিশুদের কাছে খুব প্রিয় তেমনি আধুনিক শিক্ষিত সাহিত্যিকদেরও ছড়া শিশুদের কাছে ভীষণ আকর্ষণীয়। বহিরাঙ্গিক দিক থেকে পোশাকী পরিবর্তন চোখে পড়লেও মূলত এগুলি ছড়া, যেগুলি ক্রমশ কালের গন্ডী পেরিয়ে শিক্ষিত নাগরিকদের দ্বারা সৃষ্ট। এখানেই বিচার্য, ভাবনা-বিষয়-ভাষা-ইত্যাদির মাধ্যমে এগুলি রচিত হলেও আসলে এগুলি ছড়া।

বাংলার ছড়ার জগতে বড়োদের এবং ছোটদের লক্ষ্য করে যাঁদের ছড়া স্মরণীয় হয়েছে তাঁদের মধ্যে নজরুল ইসলাম অন্যতম। শিশুদের জন্য লেখা ছড়াগুলিতে শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গি যেমন মান্য করেছেন তেমনি বড়োদের জন্য রচিত ছড়ার বক্তব্যে স্থান পেয়েছে বড়োদের মেজাজ। নজরুল তাঁর ছড়ায় লৌকিক ছন্দের সমাবেশে লোককথাকে আধুনিক জীবনের সঙ্গে মিলিয়েছেন। সাত ভাই চম্পার লোককথাটি তিনি ছড়ার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন এভাবে -

'' সাত ভাই চম্পা জাগো'' —
পারুল দি ডাক্‌ল না গো?
একি ভাই, কাঁদছ? - মা গো
কি যে কয় — আরে দুত্তুর!

পারায়ে সপ্ত সাগর
এসেছে সেই চেনা - বর?
কাহিনীর দেশেতে ঘর
তোর সেই রাজপুত্তুর?''১৯

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, ছড়ার প্রথম চরণটি উদ্ধৃতি চিহ্নে রেখেছেন নজরুল ইসলাম এবং এর মধ্যে দিয়ে 'সাত ভাই চম্পা'র লোককথাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে আধুনিক জীবনের সঙ্গে মিলিয়েছেন সেই কথকতা। দিদির বিয়ে হয়ে যাওয়ায় ভাই শঙ্কিত হয়। ভাইটি শেষ পর্যন্ত অবশ্য বলেছে; দিদি যদি বিয়ের পর ঘুমিয়ে যায় অর্থাৎ তাকে ভুলে যায় তখন সে দিদিকে জাগিয়ে তুলবে। নজরুল এখানে লোককথাটিকে পুনরায় তৈরী করলেন আধুনিক জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে। লোককথায় বর্ণিত আছে বোনটি সাত ভাইকে জাগিয়েছিল, আর এই ছড়াটিতে ছোট ভাই দিদিকে জাগাতে চাইছে। এই জাগরণ যেন সকল সম্পর্ক রক্ষার, সকল আত্মীয়তা রক্ষার জাগরণ। এই জাগরণের প্রয়োজনীয়তা আধুনিক জীবনে অহরহ।

নজরুল ইসলাম রচিত লোক ছড়ার আদলে আরেকটি ছড়া —

'ঘুম-পাড়ানী মাসি-পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো
বাটা ভরে পান দেবো গাল ভরে খেয়ো
ঘুম আয় রে, ঘুম আয় ঘুম।
ঘুম আয় রে, দুষ্টু খোকায় ছুঁয়ে যা,
চোখের পাতা লজ্জাবতী লতার মত নুয়ে যা,
ঘুম আয় রে, ঘুম আয় ঘুম।
মেঘের মশারিতে রাতের চাঁদ পড়ল ঘুমিয়ে,
খোকার চোখের পাপড়ি পড়ুক ঘুমে ঝিমিয়ে,
ঘুম আয় রে, ঘুম আয় ঘুম। ২০

এই ছড়াটি লৌকিক ছড়া 'ঘুম-পাড়ানী মাসি-পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো'র আদলে রচিত। কিন্তু এখানে একটা বিষয় দেখা যায় — চোখের পাতা লজ্জাবতী লতার মত নুয়ে যা' এবং মেঘের মশারিতে রাতের চাঁদ পড়ল ঘুমিয়ে পংক্তি দুটিতে অধিকতর কাব্য আবেদন রয়েছে। এই কাব্যে আবেদনময় পংক্তি দিয়ে ছড়া রচনা করে নজরুল অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে একটি সেতু নির্মাণের চেস্টা করেছেন। যেখানে রয়েছে বর্তমানের অর্থাৎ আধুনিকতার মধ্যে অতীতের তথা লৌকিক ছড়ার রসপোলব্ধি।

ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যেকার বাল্যরসটিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক বনফুল তাঁর একটি ছড়ায় —

ধনেশবাবুর সঙ্গে আছে
চিংড়ি মাছের মিল
একটু অমিল ছাড়া
ধনেশবাবুর দাড়ি আছে
চিংড়িমাছের দাড়া।
ধনেশবাবু গল্প বলেন
অতি চমৎকার
চিংড়িমাছের মালাইকারি
তুলনা নেই তার ২১

সাধারণভাবে বলা যায় ছড়া প্রধাণত আবেগ -অনুভূতিজাত। বুদ্ধিপ্রসূত নয়। অর্থাৎ মস্তিষ্কচর্চা অপেক্ষা হৃদয়ানুভূতির মূল্য এখানে বেশি। আলোচ্য ছড়াটিতে অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ এই উভয়দিকেই একটা অনায়াস ভঙ্গি রয়ে গেছে। একে অতি সচেতন মনের সৃষ্টি বলা যায় না। আশুতোষ ভট্টাচার্য্য যে কারণে মন্তব্য করেছেন — ''ভাবের দিক দিয়া ইহাতে পরিণতি নাই, কেবলমাত্র অস্পষ্ট আভাস ও দুর্লক্ষ্য ইঙ্গিত মাত্র আছে। রূপের ভিতর দিয়াও তেমনই অপরিণতি রহিয়াছে, অথচ ইহার এমনই ধর্ম যে, ভাবের দিক দিয়া ইহার অস্ফুটতা, কিংবা রূপের দিক দিয়া ইহার অপরিণতি ইহার রসগ্রহীতাকে আঘাত করে না।'' ২২

ছড়াতেও দেখা যায় ধনেশবাবুর সঙ্গে চিংড়ি মাছের মিল উদ্ভট একটা মজাদার বিষয় হয়ে উঠেছে। আবার ধনেশবাবুর দাড়ির সঙ্গে চিংড়ি মাছের 'দাড়া'র প্রভেদটুকু এবং ধনেশবাবুর চমৎকার গল্পের সঙ্গে চিংড়ি মাছের ''মালাইকারি'' তুলনা কৌতুকরসের বাতাবরণে চিত্তবিনোদনের নির্মল মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এখানে ছোট বড়ো সকলেই মজার রসে আপ্লুত হয়ে ওঠে। যেকারণে ছড়া হয়ে ওঠে কালজয়ী।

চলমান সমাজ-সংসারের চালচিত্র দেখে সমালোচনা করার একটা জন্মগত ইচ্ছা সকল সাহিত্যিকের মধ্যে বিরাজমান। আভিজাত্য সাহিত্যে যেমন এগুলি সর্বদাই দেখতে পাওয়া যায়, লোকসাহিত্যেও তেমনি এ বিষয়গুলিকে দেখা যায়। কোনো ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ, পরিহাস ও সমালোচনা করে তাৎক্ষণিক রসের জোগান পাওয়া যায় — লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা ছড়ার মাধ্যমে। ব্যঙ্গের শাণিত তীর আজও ছুটে চলেছে আধুনিক সাহিত্যিকদের হাত ধরে, তবে তার লক্ষ্য ধ্বংসাত্মক নয় — এর মধ্যে রয়েছে সৃষ্টির মনোবাসনা। সমাজের যে সব অদৃশ্য ক্ষতস্থানগুলি সহজে নজরে ধরা পড়ে না, সেইসব ক্ষতস্থানগুলি অতিসহজে ধরা পড়ে ছড়ার মাধ্যমে। সমাজ সুস্থ ও সুন্দর না থাকলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, যে কারণে ছড়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে সমাজের প্রতি। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এইরকম একটি ছড়া —

‘‘ ব্যঙ্গমা কয় ব্যঙ্গমিরে, গলার স্বরটি ঈষৎ খোনা
‘খবরদার! এ- অন্ধকারে চোখ খুলো, মুখ খুলো না।
দেখলে পরে বেবাক মাটি
লাগবে তোমার দাঁত কপাটি
চারপাশে যা কান্ড চলছে কোন ফ্যাসিবাদ তার তুলনা?’’ ২৩

ছড়াটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ফ্যাসিবাদের রূপক কিনা এনিয়ে সকলের কাছেই একটি সংশয় জাগরিত হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল, নেতা, তাদের মত ও পথ, গদি দখলের মরিয়া চেষ্টার ঘৃণ্য দিকটিকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় ছড়াটিতে। যেখানে রয়েছে রক্তাক্ত স্থানগুলির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

শব্দ যোজনায় অভিনবত্বের ছোঁয়ায় প্রথম পর্বের ছড়াকারদের মধ্যে যাঁরা ভেল্কি দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অমিতাভ চৌধুরী। শব্দবিন্যাসে পাঠকের চোখে ও মনে ছাপ ফেলেছেন তিনি তাঁর ছড়াতে। একজন ছড়াকার ও সাংবাদিক হিসাবে অমিতাভ চৌধুরী বহুভাষাভাষির
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে মিশেছেন। জাপানী ভাষায় উদ্ধৃতি রয়েছে তাঁর নিচের এই ছড়াতে —

নাগাসাকি বাড়ি তার
এক ছিল জাপানি
আয়েসে চুমুক দিয়ে
খাচ্ছিল চা-পানি।
হটাৎ উঠল তার
হাঁপ ধরা হাপানি।
পেয়ালাটা ছুড়ে ফেলে
কি ভীষণ লাফানি।
ভেউ ভেউ কেঁদে বলে —
‘নিকাকুরু নাপানি,
আরিগাতো গোজমাস
ফামাহিতো তাপানি। ২৪

সাম্প্রতিক কালের অনেক কবিই ছড়া লিখেছেন। এঁদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশ কিছু ছড়া সুভাষ মুখোপাধ্যায় রচনা করেছেন। তাঁর রচিত একটি ছড়া —

কাকাকে বলতে পার চাচা-ই
সকালে চেঁচান জোরে 'চা চাই'।
চাদর চাটাই কাচা গালিচা
চাইলেই চারিদিকে খালি চা খালি চা

কাকা বলে ঃ চা বিনা
চাকরি না, চাবি না —
আদৌ যায় না করা যাচাই
চা ছাড়া হয় না বাপু বাঁচাই। ২৫

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই ছড়ার ছত্রটিতে একই 'চা' ধ্বনিটি বহুবার উচ্চারিত হওয়ায় একটা শ্রুতি সৌন্দর্য সম্পাদিত হয়েছে। এখানে এই সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী ভূষণটির নাম অনুপ্রাস অলংকার। সুতরাং বলা যায় শব্দের বলিষ্ঠ ঝংকার, ছন্দের দৃঢ় অথচ সাবলীল গতি ও মিলের বিস্ময়কর প্রাচুর্য্যে ছড়াটিতে সজীব শক্তিশালী প্রত্যয় রয়েছে। তাই আধুনিককালে রচিত হয়েও এর মধ্যে রয়েছে লৌকিক ছড়ার ঐতিহ্য।

আধুনিক কালের অভিনব আর এক ছড়াকার শঙ্খ ঘোষ। তাঁর মৌলিকতার নিদর্শন আছড়ে পড়ে ছড়াতে। মিল, বিষয়গত দিক এবং আঙ্গিকগত দিক থেকে তিনি সমানভাবে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর একট ছড়া —

এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত
ন্যাজখানা লম্বায় পঞ্চাশ হাত।
সাত ছয় পাঁচ চার তিন দুই এক
তাই ধরে ধাঁই করে টান দিয়ে দেখ্।
এক দুই তিন চার পাঁচ সাত ছয়
অনুমান হনুমান পেয়ে গেল ভয়
চার পাঁচ ছয় সাত এক দুই তিন
পাকা কলা খায় না সে সত্তর দিন।
তিন দুই এক সাত ছয় পাঁচ চার
দু আঙুল হয়ে গেল ল্যাজ তাই তার
কোনখানে ধরে তবে টান দিই তার
সাত পাঁচ ভেবে দেখি তিন চারবার
লাফ দিয়ে হনুমান পেরোল পগার ২৬

ছড়ার শব্দ মূল্যবান সম্পদ। ছড়ার জগৎ অবচেতনের বা উদাসীনের সৃষ্ট জগৎ। সুতরাং এও এক মায়ার জগৎ। শিশু থেকে বৃদ্ধ বা বয়স্করা ছড়ার অসংলগ্ন চিত্রময়তায় যত না ভোলে, তার চেয়ে দলবৃত্ত ছন্দের সুর তাদের বেশি টানে। ফলে কিছু কিছু ছড়া একান্ত শিশুদের হলেও বয়স্কদের উপভোগ্য হয়ে ওঠে। ছড়াটিও দলবৃত্ত ছন্দরীতির এই জায়গা নিঃসন্দেহে অভিনব। মিলযুক্ত এই ছড়াতে বিষয়টি অভিনব না হলেও শিশুদের কাছে কিন্তু এর একটি গ্রহণ যোগ্যতা রয়েছে। ধ্বনিময় উপলব্ধি শিশুদের বোধের গভীরে পৌঁছে যায়। লৌকিক ছড়ার স্পন্দন তারা শুনতে পায়।

অভিনব শব্দ যোজনার মাধ্যমে ছড়ায় প্রাণরস সঞ্চারিত করে জ্ঞানপূর্ণ মস্তিষ্কের শিল্পচাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন আধুনিক ছড়াকার সরল দে। তাঁর একটি ছড়া —

"স - দোষেই খেলো তোকে, বলেছিল পৃথ্বি,
ভুল উচ্চারণে কি হয় আবৃত্তি?
অভ্যে S যা দো S
ঐ যে Sযামল ঘোS
S ও ছিল, তোর মতো, হল খ্যাতি কীর্ত্তি।" ২৭

শ - ষ - স কারের সাথে ইংরেজি S বর্ণের সাদৃশ্য কল্পনা করে তিন স-কারের পরিবর্তে 'S' ব্যবহার করে শব্দ প্রয়োগের ম্যাজিক দেখিয়েছেন সরল দে তাঁর এই ছড়াটিতে।

গল্পের আমেজকে ছড়ায় নিয়ে এসে ছোটদের মনভোলানো যায় এরকম কিছু ছড়ার নিদর্শন পাওয়া যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনায়। ছোট শিশুদের মনের কথা তিনি সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর ছড়াতে। যেমন —

সেপাই এসে যেই দাঁড়াল রাজা বললেন, সেলাম।
সেপাই , হটাৎ যেন বিড়ির গন্ধ পেলাম?
রাজা বললেন, রামো রামো বিড়িত নয় মূলো।
সেপাই বলল, গোঁফের ডগায় জমেছে কেন ধুলো?
রাজা বললেন, কমলা - আপেল আনব কয়েক ঝুড়ি ?
সেপাই বলল, কোথায় আমার পেঁয়াজ-লঙ্কা-মুড়ি?
রাজা বললেন, বসুন আগে এই যে সিংহাসন।
সেপাই বলল, নোংরা ওটা মাছিতে ভনভন।
রাজা বললেন, মাছি কোথায় ওগুলো সব পাখি,
সেপাই বলল, কাজে কম্মে দিচ্ছ খুবই ফাঁকি!
রাজা বললেন, নাচার হুজুর দেখাচ্ছি পা তুলে
কত বড় ফোস্কা, আমার জুতো দিন না খুলে। ২৮

ছড়াটি শুনে মনে হয় রাজা এবং সিপাই-এর গল্প কাহিনী বিবৃত হয়েছে। আপাতভাবে ছড়াটিতে দেখা যায় 'বিড়ির গন্ধ'-র সঙ্গে 'মূলোর' কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু তবুও একটি রবীন্দ্র- কথিত অসংলগ্ন ছবি, প্রত্যক্ষ সত্যের মতো ঘটে চলেছে — শিশু মন তার জন্য লোলুপ। আবার ছেলে ভুলানো ছড়ার মতো একটি ভাব ছড়ার মধ্যে কখন যে এসে উপস্থিত হয়, — তা সকলের কাছে আকর্ষণীয় বিষয়, যা লোকসাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য।

ক্রমবর্ধমান দ্রব্য মূল্যের দিনে সাধারণ মানুষের প্রাণ যখন যন্ত্রণায় জর্জরিত, মানুষ যখন আত্মহননের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন আমাদের সামনে ছড়া শাণিত তরবারি হাতে তুলে নিয়েছে। বাজার দরের অবস্থা দেখে আধুনিক ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন ছড়াকার দিগম্বর দাসগুপ্ত —

' মুখে মুখে জাগে মহা হাহাকার 'হায় রাম! হায় রাম!
বাজারে বাজারে সব জিনিসের বেড়েছে বিষম দাম!
অর্থনীতির পন্ডিত এসে
ভুল ভেঙে দিতে বললেন হেসে,
জিনিষের দাম বাড়েনিকো বোকা, কমেছে টাকার দাম। ২৯

বাংলা সাহিত্যে লিমেরিক জাতীয় ছড়াকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যিনি সম্মানের আসন দিয়েছিলেন, তিনি হলেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর রচনায় উদ্ভাবনী শক্তির প্রাচুর্য যেমন দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় কল্পনাপ্রবণ ও পরিহাসময়তা মিলেমিশে একাত্ম হয়ে গেছে। যেমন-

'' এক যে ছিল ক্রুদ্ধ এবং নব্য যুবক বর্ধমানে —
আসক্তি তার ভীষণ রাগী পদ্য লেখায়, মদ্যপানে।
মা ডেকে কন ঃ 'পুত্রবধূ আনব ঘরে।'
সুবোধ ছেলে সম্মতি দেয় লজ্জাভরে
তাকায় যখন পণ- উপহার - যৌতুকেরই ফর্দপানে।'' ৩০

কালের গন্ডী অতিক্রম করা একালের আধুনিক শিক্ষিত ছেলের মদ্যপানে ও পদ্যধ্যানে আসক্তি থাকলেও, তারা আধুনিকতার পরিচয় দিতে অক্ষম হয় মায়ের সামনে, যৌতুকের দর কষাকষির সময় বিষয়টি আরো নগ্ন হয়ে ওঠে। এই শিক্ষিত ছেলেদের ভাবনাগত পরিচয় লেখকের তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের দিকটি ঝরে পড়ে কৌতুকময়তার মধ্য দিয়ে আলোচ্য ছড়ায়। যেখানে হাসি আছে সত্য, কিন্তু ব্যাঙ্গের কষাঘাত আছে মারাত্মক।

আধুনিক ছড়াকারদের রচনায় দেখা যায় কল্পনাপ্রবণ মনোবৃত্তিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির রসময় বিশেষ করে হাস্যরসময় দিকটি ফুটে উঠে। আর যাদের সৃষ্টির জাদুমন্ত্র নতুন ভাবনার পরিচয় দেয়, তাঁরা মজার কথার মধ্যেও ব্যঙ্গের ছবি তুলে ধরতে পারেন। যেমন জগন্নাথ চক্রবর্তীর এরূপ একটি ছড়া —

এক যে ছিলেন সাধ্বী সতী, পতির সংখ্যা পাঁচ
দোষের মধ্যে সহবাসের বিচার কিংবা বাছ
ছিল না তাঁর, ছিল না মোটেও
চুমো খেতেন আপন ঠোঁটেও,
বাদ একমাত্র একাদশীতে মুখ চুম্বন ও মাছ। ৩১

কবির কবিত্বে প্রকাশিত হয় তাঁর কল্পনার ভাবাবেগ। একালের কোনো নারী সতী, কিন্তু সে পঞ্চস্বামী সোহাগিনী। পতিপ্রাণা কামাসক্ত নারীর একাদশীর দিনযাপনের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তীব্র শ্লেষ বা ব্যাঙ্গ ঝরে পড়েছে। সহবাসে বাছ বিচার সে করেনা তবু সে সতী! উভয় দিকেই সে পারদর্শী। এই বড়োদের ভাবনাগুলিকে ছড়ার মাধ্যমে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে ছড়াকারের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সময়ের আরো একজন মজাদার ছড়া রচয়িতা হলেন ভবানীপ্রসাদ মজুমদার। তাঁর একটি ছড়ার বইয়ের নামই 'মজার ছড়া'। এই বইটির প্রতিটি ছড়া পড়তে গিয়ে পাঠককে হাসতেই হয়। যেমন —

বিদঘুটে এক বাঁদর ছানার সাড়ে ন- হাত নাক ছিল
বাঁদর ওয়ালা নাকের ডগায় বালতি বেঁধে রাখছিল!
কারণ সে খুব আদরের
বিদঘুটে সেই বাঁদরের
সাড়ে ন-হাত নাকের ডগায় মৌমাছির চাক ছিল
মধুর লোভেই বাঁদরওলার নাকের উপর তাকছিল।৩২

ছড়া রচনা করতে গেলে চাই সৃজনী শক্তির উপস্থিতি। কারণ, সত্যকথা বলা সহজ, কিন্তু স্বপ্ন রচনা করা খুবই কঠিন। যেমন তেমন করে লিখলেই ছড়া হয় না, — এই যেমন ভাবটি পাওয়া বড়ো সহজ কথা নয়। আসলে যা সবচেয়ে বেশি সরল, তা সবচেয়ে বেশি কঠিনও বটে, — সহজের প্রধান লক্ষণই তাই। পৃথিবীর মুঠো মুঠো অপ্রয়োজনীয় বা তুচ্ছতার ধূলি নিয়ে ইন্দ্রজাল করা কেবল হৃদয়ের উল্লাসেই সম্ভব। যে কারণে ছড়া বিষয়টি যার কাছে সহজ তার কাছে অতিকায় সহজ, কিন্তু যার কাছে কঠিন তার কাছে অসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

এজাতীয় ছড়াগুলিতে সত্য খুঁজতে যাওয়া খুব কঠিন কারণ এখানে অসংগতি বিদ্যমান, কোনটির মধ্যে ঘটনার ধারাবাহিকতা থাকে না। বেশিরভাগ কথা বানানো হলেও সচেতনতা থাকে না। অথচ অতিসহজে প্রত্যক্ষের মতো ছড়াগুলি দেখতে পাওয়া যায়। এই ছবিগুলি শিশুমনকে খুব সহজে আকৃষ্ঠ করে। তাই অলোচ্য ছড়াটিতে বাঁদরের সাড়ে-ন-হাত নাক, কিংবা নাকের ডগায় বালতি বাঁধার কাহিনী, মৌমাছির চাক ইত্যাদি বিষয়গুলি টুকরো ছবি হয়ে মনে আনন্দ ও স্নিগ্ধতা নিয়ে আসে। এখানেই একজন ছড়া রচনাকারীর সার্থকতা।

আমাদের জীবনযাত্রার এবং জীবনের আগাগোড়া বিভিন্ন পরিবর্তনের বিভিন্ন আচার-আচরণের নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রভাব প্রায়ই দেখা যায়, খাদ্যাভ্যাসে, পোষাক-পরিচ্ছদে, কথাবার্তায়, বিনোদনে সর্বত্রই পরিবর্তনের জোয়ার বয়ে চলেছে। যেখানে স্বদেশিয়ানা থেকে বিচ্যুত হয়ে বিদেশীয়ানায় ধাবিত হওয়া খুব সহজ ব্যাপার। ছড়াকার মৃত্যুঞ্জয় কুন্ডু রচিত এরকম একটি ছড়া —

পাল্টাচ্ছে দিন কাল, পার করে তিন কাল, বলেন সনাতন সাঁই
ইঁটপাতা সেলুনেতে আসতাম চুল ছেঁটে, ইদানিং পার্লারে যাই।
আগে খেয়ে ভাত রুটি
চলতো হে মোটামুটি,
সম্প্রতি ফিস ফ্রাই প্রতিদিন খাই, ডিনারেতে চাউমিন চাই।

ঠিক এরকম আরেকটি পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায় শিশু মনের মানসিকতার বদলের। শিশুদের চারপাশ ধারে ধারে কীভাবে বদলে গেছে তার পরিচয় আমরা পাই রাজেন চক্রবর্তীর একটি ছড়ায় —

‘ঘুম পাড়াতে আর লাগে না ঘুমপাড়ানি গান,
এখন শিশুর ঘুম এনে দেয় টিভির শক্তিমান
পুতুল খেলা আর চলে না
আয় তো খেলি - কেউ বলে না,
রিমোট হাতে ঘুমোয় শিশু, খেলনা মেশিনগান। ৩৩

অনুকরণের হাওয়ায় নিজেদের মৌলিকতা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বাঙালির নিজস্ব ছিন্নমূল হারিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম দুনিয়ার ভাবাবেগে, বিশ্বের সকল সংস্কৃতি মিলেমিশে মিশ্রিত সংস্কৃতির বাতাবরণে এগিয়ে চলেছে। যা আজকের প্রজন্মের কাছে ভীষণ প্রয়োজন বলে গ্রহনযোগ্যতা পাচ্ছে - কিন্তু যাদের মন পুরোনো স্মৃতিতে ভরে আছে তাঁরা হয়তো ভালো চোখে নিতে পারছে না তবুও মেনে নিতে হচ্ছে তাঁদের। বিউটি পার্লারে আগত ছেলেদের ভিড় দেখে (মেয়েদের তুলনায়) তাঁদের মনে হয়েছে গুণের ভাঁড়ারে কিছু নেই বলেই, রূপের ভাঁড়ার পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে আগমন। ছেলেদের প্রয়াস এরকম —

স্বদেশী রূপচর্চা ভুলে বিলাস - ব্যসনে
কেন রে সব মাতিস তোরা বিদেশী ফ্যাসানে ?
যতই কড়া বিলিতি ঢঙে
রাঙাস মুখ বিদেশী রঙে,
বিষিয়ে যেন যায় না মন বিলিতি প্যাসানে, ৩৪

বর্তমান বাজারে ঘরে বাইরে ঘুষের ব্যবসা অহরহ ঘটে চলেছে। নানা ধরণের ঘুষলোভী মানুষের অন্ত নেই। অতি সহজে অসৎপথে টাকা রোজগার করে শীঘ্রই ধনীর মর্যাদা লাভ করার প্রবল বাসনা, বর্তমান সমাজকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ভুল পথে চালিত হচ্ছে। কিন্তু ঘুষ নেওয়ার এবং দেওয়ার কৌশল রপ্ত করতে হচ্ছে। কিন্তু সমাজ যে ধীরে ধীরে রসাতলে যাচ্ছে তাতে চিন্তিত নয় কেউ -ই। এই প্রতিযোগিতার পথ ধীরে ধীরে ক্রমশ বাড়তে থাকায় প্রশ্ন জাগে লঙ্কায় গেলে সবাই যদি রাবণ হয় তা হলে বানরের কথা ভাববে কে ? — সমাজ বাস্তবতার এই চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে নিম্নের ছড়াটিতে —

চলছে এমন ঘুষের বাজার
বেতন ছাড়াও হাজার হাজার,
হচ্ছে গাড়ি, হচ্ছে বাড়ি
গাড়ি ছাড়া, দেয় না পাড়ি
'স্ট্যাটাস' টা ঠিক মহারাজের। ৩৫

সম্প্রতিককালের ছড়াকার পবিত্র সরকার প্রচলিত ছড়াকে সজীবতা দিয়ে প্রশ্নবোধক বাক্যের মধ্য দিয়ে ছড়ার নতুনত্বের একটি দিককে তুলে ধরেছেন। ছড়ার মধ্যে লুকিয়ে আছে টুকরো টুকরো প্রশ্নের উত্তর রয়েছে কৌতুক শিশুর স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করার উৎসাহমূলক শব্দ এই নিজস্বতার জন্য আধুনিক কালে ছড়া তার মূল্য হারায়নি, বরং নতুনত্ব নিয়ে হাজির হয়েছে। যেমন —

কাঁদছে কে রে ? খোকাটা কি ?
এ বাড়ির সেই বোকাটা কি ?
হাসছে কেরে খুকিটা কি ?
এ বাড়ির চাঁদ মুখীটা কি ?
যে কাঁদ সে খায় কি জিনিষ ?
বকুনি।
যে হাসে তার আদর জোটে
তখুনি
আয়রে খোকা খিলখিলিয়ে হাসত —
হাসলে দেব মিল্ক-চকোলেট আস্ত । ৩৬

ছড়াটি লৌকিক ছড়া ''হাত ঘুরোলে নাড়ু দেব / নইলে নাড়ু কোথায় পাব ,/ সোনার নাড়ু গড়িয়ে দেব,/ পড়ে গেলে কুড়িয়ে দেব,'' — এর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। লৌকিক ছড়াতে যেমন সোনার নাড়ুর উল্লেখ আছে, এখানে তেমন মিল্ক চকোলেট উল্লেখ আছে। এখানে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। ছড়ায় আন্ত্যমিলের কারণে অনুপ্রাসের ব্যবহারে অসাধারণ ধ্বনি বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই ধ্বনি বৈচিত্র্য ছড়াটিকে শ্রুতিমধুর করে তুলেছে।। এবং প্রশ্নগুলির মধ্যে রয়েছে শিশুকে মুগ্ধ করার মতো শব্দ, যা শুনে শিশুরা প্রবল ভাবে আকৃষ্ট হয়।

লৌকিক ছড়াতে যেমন তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক কালেও তেমনি ছড়ার মধ্যে রাজনৈতিক দিকটি লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক আন্দোলনের নানা গৌরবময় ইতিহাস ছড়াতে বিভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। লৌকিক ছড়া আমাদের যে সব ইতিহাস জানতে যেমন সাহায্য করে অপরদিকে তেমনি সাহায্য করে মৌখিক সাহিত্য হিসাবে ছড়ার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠায়। আধুনিক যুগেও ছড়ার মাধ্যমে রাজনীতির বিভিন্ন ঘটনা বা কাহিনীকে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন —

একাত্তরের হাতিয়ার
গর্জে উঠুক আরেকবার। ৩৭

বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বাসনায় জনসাধারণ বর্বর পাকবাহিনীকে পরাস্ত করে স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু যে প্রত্যাশা নিয়ে দেশের সাধারণ মানুষ অন্দোলন করে স্বাধীনতা আদায় করে তা পূরণ হয়নি। রাষ্ট্র পরিচালনায় যখন যে দল ক্ষমতা অর্জন করে তখন সে দল দেশের মানুষের সঙ্গে স্বৈরাচারীর মতো আচরণ করে। এই অন্যায় আচরণ সাধারণ মানুষ সহ্য না করে নতুনভাবে স্বাধীনতার মন্ত্রে জাগরিত হতে চায়। আর এ ধরণের ছড়াগুলি তাদেরকে প্রেরণা যোগাতে সাহায্য করে। এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়।

দেশের শাসন বিভাগের মূল চাবিকাঠি থাকে রাজনৈতিক নেতাদের হাতে। তাঁরা বিভিন্ন আশা - আশ্বাস দিয়ে জনসাধারণের মন জয় করে। দেশের মানুষকে স্বপ্ন দেখায় উন্নতশীল দেশ গড়ার সংকল্প নিয়ে। তাঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্য থাকে মানব কল্যাণ সাধন করা। সুদিনে, দুর্দিনে মানুষের পাশে থাকাই তাঁদের মূলমন্ত্র। কিন্তু সেখান থেকে বিচ্যুতি ঘটলে সাধারণ জনগণের কাছে আশাভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই আশাভঙ্গের বা রাজনৈতিক নেতারা তাদের কাছে হয়ে ওঠে ঈর্ষার পাত্র। যার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় ছড়াতেও —

''বান ভাসিরা কোথায় গেল ? খোঁজ করছে দিল্লী
সাংসদেরা কেঁদে ভাসায়, করছে চেল্লা মিল্লি।
সতেরো দিন পরে এসে
গন্ধ রুমাল নাকে ঠেঁসে,
রিপুটে লেখেন, বানভাসি নেই, মরেছে এক বিল্লি। ৩৮

ছড়াটিতে নেতাদের কার্যকলাপ তুলে ধরা হয়েছে কৌতুকের মাধ্যমে। নেতারা ভোটে জিতে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে কর্মসূচির তালিকা করেন। অনাবৃষ্টি হোক আর অতিবৃষ্টি হোক — বাবুরা বাইরে এসে দেখার সময় পান না। তাঁর রিপোর্ট লিখে দেওয়ার পর সেই অনুসারে কাজ হয় সমাজের। এই ছড়াতে দেখা যায় বন্যায় কোনো মানুষের ক্ষতি হয়নি, মারা গেছে শুধুমাত্র একটি বেড়াল। এখানে রাজনীতির নেতাদের নীতিহীনতার প্রকাশ ঘটিয়ে সর্ব সমক্ষে তুলে ধরা হয়েছে।

রাজনীতি এমন একটা ব্যাপার যেখানে রঙে রসে মানুষকে মন ভোলানোর প্রতিযোগিতা চলে। এ এক অন্য স্বাদের বাজার। এই বাজারের জন্য কোনো পুঁজি দরকার হয় না। মৌখিক বুলি আউরে একে অপরের ওপর দিয়ে বাজিমাত করতে চায়। ধর্ম - অধর্ম বলে কিছু থাকে না। ধর্মের তুলনায় অধর্মের জয় এখানে প্রভাব বিস্তার করে বহুল পরিমানে। মৃদুভাষী, মিথ্যাবাদী, বাহুবল সবই এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজন। যে যত বহুরূপী হতে পারবে সে তত তাড়াতাড়ি গদিতে বসতে সক্ষম হয়। এর প্রমাণ সর্বত্রই পাওয়া যায়। ছড়াতেও উঠে এসেছে এরকম কিছু ঘটনা। যেমন —

আমরা এখন নাটক করি, সমপিরীতের নাটক
ডিগবাজী খাই, মিছিল করি, সাজিয়ে তোরণ- ফাটক।
মহড়া দিই ধাপ্পাবাজির
ডাকলে হুজুর অমনি হাজির,
হুকুম পেলেই তালিম করি; বিরোধী দেখলে আটক। ৩৯

কালের বিবর্তনে উৎপাদন প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে বদলায়, বদলায় সংস্কৃতির ব্যবহারিক বাহিরাঙ্গিক রূপটিও। কিন্তু মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিত থাকে তার অন্তর্নির্হিত মানস পরিকাঠামোটি। নতুন থেকে আরও নতুন স্তরের অর্থনৈতিক বিবর্তনের ফলে সমাজ- কাঠামো কীভাবে বাইরের দিকে পাল্টে যায় — তা বহু আগে দেখিয়েছেন মর্গান এবং এঙ্গেলস্ তাঁদের ''এনসেন্ট সোসাইটি'' এবং ''অরিজিন অব দ্য ফ্যামিলি'', ''প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড স্টেট'' নামক গ্রন্থগুলিতে। অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে মানুষের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ ঘটে। সমাজতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে রীতি -প্রকরণের বহিরঙ্গে একটু একটু করে পরিবর্তন হলেও ভিতরের ভাবগত কাঠামো কিন্তু অবিকৃতই থেকে যায় — এমন কথাটি সংস্কৃতি বিজ্ঞানের তাত্ত্বিকরা প্রমাণ করেছেন নানা ভাবে। মানুষের জীবনযাত্রার ধরন -ধারণ পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে যতই বদলাতে থাকে, ততই তার সামাজিক অভিব্যাক্তিগুলি পাল্টাতে থাকে। এরই অভিক্ষেপ ঘটে মানুষের ব্যবহারিক এবং মানসিক ক্ষেত্রে —

ফলে সমস্ত কিছুর অনুসঙ্গে প্রতীয়মান হয় একটা পালাবদল। অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্তের ভাষায় —'' ঐ পালাবদল নেহাৎই পোষাকী। লোকজীবনের শিকড়ে বহুকালীন যে ঐতিহ্য - চেতনা প্রাণরস সঞ্চার করে যায় নিরন্তরভাবে, তার অলক্ষ্য কিন্তু অপ্রতিরোধ্য সঞ্জীবনী শক্তি নাগরিক / পরিশীলত কলাকৃষ্টিকে পুষ্ট করে, সেই ঐতিহ্যকে আমরা কোনও সময়েই মন থেকে নির্মাঞ্চিত করতে পারি না, পারি নি।'' ৪০

সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমগুলির ব্যবহারিক প্রকাশও ক্রমশ প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। লোকসাহিত্যের প্রকরণের মধ্যেও এই বিবর্তিত রূপ দেখা যায়। যেমন — টুসু, ভাদু, গম্ভীরা ইত্যাদি লোকসাহিত্যের বিষয়গুলি প্রারম্ভিকভাবে পূজাকেন্দ্রিক ও আচারভিত্তিক হলেও কালের অগ্রগমনে এদের প্রতিবেদনের উপজীব্যটা ধীরে ধীরে সংবাদ ভিত্তিকের পর্যায় এসে দাঁড়িয়েছে। গম্ভীরা গানের বয়ানে এসেছে নবিপুরের দারোগাবাবু কীভাবে ঘুষ নিয়েছিল তার বিবরণ, ভাদুগানের বিবরণে এসেছে মানবাজারের জোতদারের অত্যাচারের ভূমিকা প্রভৃতি। এরকমই লোকসাহিত্যের একটি প্রকরণ লৌকিক ছড়া। এই লৌকিক ছড়ার আদলে আধুনিক যুগের ছড়াকাররা বিভিন্ন ভাবে রচনা করেছেন। যেখানে দেখা যায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বহুবিধ সামগ্রী, দেখা যায় অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক প্রসার, এভাবে বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি ছড়ার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁদের বাণিজ্যিক প্রসার ঘটিয়েছে। যেমন — গাড়ী নির্মানকারী টাটা মোটরস সংস্থাটির বিজ্ঞাপন —

শারদোৎসব এলো আবার
পরিবারেও খুশির জোয়ার । ৪১

পোষাক -পরিচ্ছদ নির্মাণকারী সংস্থা রাজু কোম্পানী বিজ্ঞাপন দিয়েছে এভাবে —

পূজোর মজা সাজুগুজু
অন্দরেতে শুধুই রাজু । ৪২

অম্বুজা সিমেন্ট প্রস্তুতকারী সংস্থার বিজ্ঞাপন ছড়ার মাধ্যমে উপস্থিত হয়েছে এভাবে

মাতৃপূজায়
দশভূজা
গৃহানির্মাণে
অম্বুজা। ৪৩

বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত ছড়ার আস্বাদন সকলেই করতে ভালোবাসে। সুতরাং এগুলির শিল্পগুণ থাকা বাঞ্ছনীয়। যেকারণে নির্মাতারা ছড়াগুলিকে সাহিত্যগুণ সম্পন্ন করে রচনা করেন। কিন্তু এগুলির মূল অন্তকাঠামোয় ছড়ার বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় আছে। এক্ষেত্রে ছড়াকে বলা যায় সামাজিক সংযোগ - সঞ্চারণের একটি মাধ্যম। তাই স্বাভাবিক ভাবেই বিজ্ঞাপনের যুগেও ছড়ার প্রাসঙ্গিকতা অপরিহার্য। লৌকিক ছড়ার ঐতিহ্যকে বজায় রেখেই আধুনিক ভাষায় তার সৃষ্টি।

লৌকিক ছড়ার অবয়বের দিকটিও আধুনিক ছড়ায় পরিলক্ষিত হয়। যেমন বিজ্ঞপনের বিষয় নিয়ে একটি ছড়া —

আসছে পূজোর পাঁচটা দিন
কাটবে খুব মজাতে,
প্রথমে আছে ভি. কে. বসাক
সক্কলকে সাজাতে । ৪৪

ভি. কে. বসাক জুয়েলার্স নামক স্বর্ণ অলঙ্কার তৈরীর একটি সংস্থানের বিজ্ঞাপনে এই ছড়াটি ব্যবহৃত হয়। লৌকিক ছড়া শিশুদের মনোরঞ্জনের মূলত রচিত হয়। যে কারণেই ছড়ায় শব্দের বিশেষ ভুমিকা থাকে। কখনো যুক্ত ব্যঞ্জন ব্যবহার করে কখনো শিশুদের মতো উচ্চারণ ঘটিয়ে শব্দকে শিশুদের আকর্ষণীয় করে তোলা হয়, আবার কখনো উদ্ভট শব্দ প্রয়োগ করেও শিশুদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়। এখানে এরকম একটি শব্দ 'সকল' হয়েছে 'সক্কল' যা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই অধ্যায়ের পরিশেষে এসে আমরা বলতে পারি কালের গন্ডী অতিক্রম করে মানুষের চিন্তা ধারায় আসে ব্যাপক পরিবর্তন। এই পরিবর্তন ঘটলেও সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা কোনোভাবেই লুপ্ত হয়ে যায় না বরং পুরানো ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে নতুন নতুন ভাবনার সৃষ্টি হয়। আর এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি বিভিন্ন ছড়াতে। চড়া জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে, মানুষের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা জাগ্রত করার মাধ্যম হয়ে ওঠে। এই ছড়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় ঐতিহ্য, নান্দনিকতা, সামাজিক সচেতনতার সম্পৃক্ত বিষয়গুলি। প্রায়োগিকতার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে কোনো ছড়াই মানবজীবনের সাথে কোনো না কোনো ভাবে সম্পৃক্ত। আসলে ছড়া লোকসাহিত্যের এমনই একটি শাখা যা খুব সহজেই মানুষের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। বর্তমানকালে এসে শুধুমাত্র গ্রামকেন্দ্রিক না থেকে নগরসমাজের মধ্যেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। এই ছড়া ব্যবহারের মাধ্যমে সমগ্র দেশের মানুষকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সম্পর্কে বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায় খুব সহজ ভাবে। আবার আধুনিক গণমাধ্যম হিসাবেও ছড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান সর্বদা বিরাজমান। সুতরাং উনবিংশ বিংশ শতাব্দীর বাস্তব সমাজের চিত্রশালাটি অন্নদাশঙ্কর ও তার সমকালীন সাহিত্যিকদের হাত ধরে সাহিত্যের দর্পণে সমাজের বিবর্তিত রূপের বিকাশে মুদ্রণ যুগে এসেও এর গুরুত্ব কোন অংশে থেমে থাকেনি। হয়তো কালের বিবর্তনে ঘটা আর্থ সামাজিক প্রয়োজনে বহিরাঙ্গিক কিছু রূপান্তর ঘটে কিন্তু আপন ঐতিহ্যের আশ্রয় থেকে ছিন্ন করা যায় না, যাবেও না।

(১) সরকার যোগীন্দ্রনাথ ঃ খুকুমণির ছড়া (সংকলক) শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৮১, ভূমিকাংশ।

(২) ভট্টাচার্য্য আশুতোষ ঃ বাংলার লোকসাহিত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃষ্টা - ৬৫৩।

(৩) মিত্র শৈলশেখর ঃ (সম্পাদিত) ছবি ছড়ার দেশে, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৩, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৫

(৪) মিত্র শৈলশেখর ঃ (সম্পাদিত) ছবি ছড়ার দেশে, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৩, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৭

(৫) মিত্র শৈলশেখর ঃ (সম্পাদিত) ছবি ছড়ার দেশে, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৩, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৮

(৬) মিত্র শৈলশেখর ঃ (সম্পাদিত) ছবি ছড়ার দেশে, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৩, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৯

(৭) মিত্র শৈলশেখর ঃ (সম্পাদিত) ছবি ছড়ার দেশে, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৩, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৩

(৮) সরকার যোগীন্দ্রনাথ ঃ ছোটদের অমনিবাস (সম্পাদনা), হিমাংশু সরকার, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা,১৯৯৮ পৃষ্ঠা-২১২

(৯) মিত্র শৈলশেখর ঃ (সম্পাদিত) ছবি ছড়ার দেশে,তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৩, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৭

(১০) সরকার হিমাংশু ঃ ছোটদের অমনিবাস (সম্পাদনা), এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা,১৯৯৮, ভূমিকাংশ।

(১১) সরকার পবিত্র ঃ লোকভাষা লোকসংস্কৃতি, চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা - ৮৫

(১২) মিত্র শৈলশেখর ঃ (সম্পাদিত) ছবি ছড়ার দেশে, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৩, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা।

(১৩) রায় সুকুমার ঃ আবোল তাবোল, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, ১৪০৪, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ২৪

(১৪) বসু নির্মল ঃ আমার ছড়া, শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৫

(১৫) বসু নির্মল ঃ আমার ছড়া, শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৫

(১৬) বসু নির্মল ঃ আমার ছড়া, শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৫

(১৭) বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ ঃ বাংলা লিমেরিক সংগ্রহ, আনন্দধারা প্রকাশনী, ১৯৮৯, কলকাতা

(১৮) ভদ্র কালিদাস ঃ ছোটদের ছড়া, হোলি চাইল্ড পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ২০০৬, কলকাতা।

(১৯) চক্রবর্ত্তী বরুণকুমার ঃ বাংলা ছড়া পরিক্রমা (সম্পাদিত), অক্ষর প্রকাশণী, কলকাতা, ২০১৪। পৃষ্ঠা - ২৯৪

(২০) চক্রবর্ত্তী বরুণকুমার ঃ বাংলা ছড়া পরিক্রমা (সম্পাদিত), অক্ষর প্রকাশণী, কলকাতা, ২০১৪। পৃষ্ঠা - ২৯৪

(২১) মিত্র শৈলশেখর ঃ ছবি ছড়ার দেশে (সম্পাদিত), এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃঃ ৪৫

(২২) ভট্টাচার্য্য আশুতোষ ঃ বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খন্ড, এ.মুখার্জী এন্ড কোং, কলকাতা, ২০০০, পৃঃ ১৪৭

(২৩) বন্ধ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ ঃ বাংলা লিমেরিক সংগ্রহ, আনন্দধারা, কলকাতা ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৭৩

(২৪) মিত্র শৈলশেখর ঃ ছবি ছড়ার দেশে (সম্পাদিত), এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ঃ ১০৬

(২৫) মিত্র শৈলশেখর ঃ ছবি ছড়ার দেশে (সম্পাদিত), এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ঃ ৮৫

(২৬) মিত্র শৈলশেখর ঃ ছবি ছড়ার দেশে (সম্পাদিত), এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ঃ ১১১

(২৭) বন্ধ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ ঃ বাংলা লিমেরিক সংগ্রহ, আনন্দধারা, কলকাতা ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৬৮

(২৮) মিত্র শৈলশেখর ঃ ছবি ছড়ার দেশে (সম্পাদিত), এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ঃ ১১৭

(২৯) মুখোপাধ্যায় মৃণালকান্তি ঃ বাংলা সাহিত্যে লিমেরিক, অরিয়ল, কলকাতা, ১৪২১, পৃঃ ৩২

(৩০) মুখোপাধ্যায় মৃণালকান্তি ঃ বাংলা সাহিত্যে লিমেরিক, অরিয়ল, কলকাতা, ১৪২১, পৃঃ ৩৯

(৩১) মুখোপাধ্যায় মৃণালকান্তি ঃ বাংলা সাহিত্যে লিমেরিক, অরিয়ল, কলকাতা, ১৪২১, পৃঃ ৩৬

(৩২) মুখোপাধ্যায় মৃণালকান্তি ঃ বাংলা সাহিত্যে লিমেরিক, অরিয়ল, কলকাতা, ১৪২১, পৃঃ ৯৯

(৩৩) মুখোপাধ্যায় মৃণালকান্তি ঃ বাংলা সাহিত্যে লিমেরিক, অরিয়ল, কলকাতা, ১৪২১, পৃঃ ৯৭

(৩৪) মুখোপাধ্যায় মৃণালকান্তি ঃ বাংলা সাহিত্যে লিমেরিক, অরিয়ল, কলকাতা, ১৪২১, পৃঃ ৯৭

(৩৫) মিত্র শৈলশেখর ঃ ছবি ছড়ার দেশে (সম্পাদিত), এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃঃ ১৩১

(৩৬) চক্রবর্ত্তী বরুণকুমার ঃ বাংলা ছড়া পরিক্রমা (সম্পাদিত), অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃঃ ৩৬৮

(৩৭) মুখোপাধ্যায় মৃণালকান্তি ঃ বাংলা সাহিত্যে লিমেরিক, অরিয়ল, কলকাতা, ১৪২১ পৃঃ ১২২

(৩৮) মুখোপাধ্যায় মৃণালকান্তি ঃ বাংলা সাহিত্যে লিমেরিক, অরিয়ল, কলকাতা, ১৪২১

পৃঃ ১১৮

(৩৯) সেনগুপ্ত পল্লব ঃ লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি কলকাতা, ১৯৯৫, পৃঃ ৩৫

(৪০) চক্রবর্ত্তী বরুণকুমার ঃ বাংলা ছড়া পরিক্রমা (সম্পাদিত), অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃঃ ৩৩৬

(৪১) চক্রবর্ত্তী বরুণকুমার ঃ বাংলা ছড়া পরিক্রমা (সম্পাদিত), অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃঃ ৩৩৭

(৪২) চক্রবর্ত্তী বরুণকুমার ঃ বাংলা ছড়া পরিক্রমা (সম্পাদিত), অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃঃ ৩৩৭

(৪৩) চক্রবর্ত্তী বরুণকুমার ঃ বাংলা ছড়া পরিক্রমা (সম্পাদিত), অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃঃ ৩৭৮